আরজ আলী সমীপে

আরিফ আজাদ

আরজ আলী সমীপে

আরিফ আজাদ

সমকালীন প্রকাশন

আরজ আলী সমীপে

আরিফ আজাদ

প্রথম প্রকাশ

একুশে বইমেলা ২০১৮

পরিবেশক

সিজদাহ.কম

০৯-৬১১১-৬৭৭-০৬০, ০১৬১৪-৭১১-৮১১

প্রচ্ছদ, পৃষ্ঠা সজ্জা এবং মুদ্রণ

নুসরাহ পাবলিশিং সার্ভিসেস : ০১৬১৪-১১১-০০০

অমর একুশে বইমেলায় পরিবেশক

চর্চা গ্রন্থ প্রকাশ

মূল্য ২৫০ [দু'শ পঞ্চাশ] টাকা মাত্র

ISBN: 978-984-34-3956-7

Published by Somokalin Prokashon, Dhaka, Bangladesh

Price : Tk. 250.00 US $ 20.00 only.

সমকালীন প্রকাশন

ইসলামি টাওয়ার (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা : ০১৬১৬-৬২৬-৬৩৬

উৎসর্গ

নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন এবং আমার মরণ সবকিছু শুধুমাত্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার জন্য।

প্রকাশকের কথা

বর্তমান সময়ে আমাদের সমাজে যে কয়েকটা জিনিস মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, সেগুলোর মধ্যে একটি হলো নাস্তিকতা। ধর্মবিদ্বেষ, ধর্মের অপব্যাখ্যাসহ বিভিন্ন কার্যকলাপ দিন দিন যেন বেড়েই চলেছে। ব্লগ, ফেইসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে এসব নিয়ে হরহামেশাই এখন লেখালেখি, তর্কাতর্কি হচ্ছে।

শত শত মুসলিম তরুণ এই অপব্যাখ্যা এবং বিদ্বেষের মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে ধর্ম থেকে সরে যাচ্ছে। তাদের মনে নানারকম প্রশ্ন, সন্দেহ ঢুকিয়ে দিচ্ছে বিরুদ্ধবাদীরা।

বাংলাদেশের নাস্তিকতা-জগতে একটি পরম শ্রদ্ধেয়, উচ্চারিত এবং বহুলপ্রচারিত নাম আরজ আলী মাতুব্বর। জন্মেছেন বরিশালে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও নিজে নিজে স্বশিক্ষিত হয়েছেন বলে জানা যায়।

ধর্মের প্রতি একধরনের বিতৃষ্ণা থেকে উনি কলম ধরেছিলেন বলে লোকমুখে শোনা যায়। এই বিতৃষ্ণা থেকে উনি ধর্ম নিয়ে বেশ কিছু আপত্তি, প্রশ্ন এবং সন্দেহ উত্থাপন করেছিলেন। এই প্রশ্নগুলো নাস্তিকসমাজে বহুলব্যবহৃতও হয়। বাংলা নাস্তিকসমাজের পুরোধা এই লোকের লিখিত বইয়ের জবাব হিসেবে কোনো বই বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে লিখিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। উনার বইপত্র পড়ে যেসব শিক্ষিত যুবক শ্রেণি সন্দেহের বেড়াজালে আটকা পড়ছে, তাদের জন্য আরজ আলী মাতুব্বরের বইয়ের বিপরীতে উনার যুক্তি, প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা ছিল সময়ের একটি অন্যতম দাবি।

আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের সময়ের অন্যতম তরুণ লেখক আরিফ আজাদ সেই কাজটিই হাতে তুলে নিয়েছেন। অবিশ্বাসীদের মৌচাকে তিনি প্রথম ঢিল ছুড়েছিলেন গত বছরের বইমেলায় প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ লিখে। বিশ্বাসীমহলে বর্তমানে ব্যাপক জনপ্রিয় এই লেখক এবার আরজ আলী মাতুব্বরের প্রশ্নের জবাবে লিখেছেন আরজ আলী সমীপে। বইটিতে তিনি আরজ আলী মাতুব্বর সাহেবের উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর জবাব তো দিয়েছেনই, সাথে ছুড়ে দিয়েছেন পাল্টা প্রশ্নও।

এতদিন আরজ আলী মাতুব্বরের বইপত্র পড়ে যারা বিভ্রান্ত হতো, যারা মনে করত আরজ আলী মাতুব্বরের অবস্থান সঠিক এবং প্রশ্নাতীত, লেখক আরিফ আজাদের নতুন বই আরজ আলী সমীপে তাদের নতুন করে ভাবতে বাধ্য করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস, ইনশাআল্লাহ।

আমরা চেষ্টা করেছি বইটিকে নাস্তিকতার বিপক্ষে, আস্তিকতার পক্ষে একটি দলিল, একটি রেফারেন্স বই হিসেবে উপস্থাপন করতে। শার'ঈ দৃষ্টিকোণ থেকে যেন কোনো সমস্যা না থাকে, সে জন্যে আমরা বইটি প্রখ্যাত আলেম দ্বারা শার'ঈ সম্পাদনাও করে নিয়েছি। এরপরও এতে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। যেকোনো ধরনের ভুলত্রুটি যদি বোদ্ধা পাঠকমহলের দৃষ্টিগোচর হয়, আমাদের জানানোর বিশেষ অনুরোধ করছি। আমরা সেটা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করব এবং সংশোধন করে নেব, ইনশাআল্লাহ।

আমরা লেখক আরিফ আজাদের দীর্ঘায়ু কামনা করি। দ্বীনের জন্য তার মেহনতের বদলা হিসেবে তিনি যেন জান্নাতে উচ্চতর আসন লাভ করতে পারেন, আল্লাহুম্মা আমীন।

লেখকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন। শুকরিয়া সেই মহান সত্তার, যিনি আমাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন। দরূদ এবং সালাম প্রিয় নবী (সা.) এর প্রতি।

বাংলা অন্তর্জালে কিংবা বাংলাসাহিত্যে নাস্তিক্যবাদী লেখাজোখা বলতেই প্রথমে যার নাম চলে আসে তিনি হলেন আরজ আলী মাতুব্বর। নিজের অবিশ্বাসী দর্শনের পক্ষে উনি কিছু বইপত্র লিখেছেন। প্রশ্ন করেছেন। যুক্তি দেখিয়েছেন।

প্রশ্ন করতে কার না ভালো লাগে? মানুষের স্বভাবজাত একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, সে প্রশ্ন করতে পারে। এই ক্ষমতা আছে বলেই সে মানুষ। একটি গরুর সামনে যদি কিছু প্ল্যাস্টিক রাখা হয়, তাহলে গরুটি প্রথমে প্ল্যাস্টিকের গন্ধ শুঁকবে। এরপর হয়তো-বা আলতো করে জিহ্বা দিয়ে একটু পরীক্ষা করবে। যখন দেখবে এই জিনিস তার গলাধঃকরণ করার উপযুক্ত না, গরুটি তখন ভদ্রভাবে তার বিশাল মাথাটি অন্যদিকে সরিয়ে নেবে। গরুটি জানতে চায় না প্ল্যাস্টিক খেলে কী হয়, জানতে চায় না প্ল্যাস্টিক খাওয়া যায় না কেন ইত্যাদি। কিন্তু একজন মানবশিশু, যে সবেমাত্র একটু আধটু বুঝতে শিখছে, সে প্রশ্ন করে। সে তার বাবার হাতের আঙুল ধরে জানতে চায় আকাশ নীল কেন, রাত কেন কালো, পাহাড় কেন এত উঁচু, পাখি কেন উড়তে পারে ইত্যাদি প্রশ্নবাণে সে জর্জরিত করে তার বাবা-মাকে, তার আশপাশের সবাইকে। এই যে প্রশ্ন করার ক্ষমতা, চিন্তা করার ক্ষমতা, এটা প্রাণিজগতে একমাত্র মানুষেরই আছে।

মানুষ অজানাকে জানার জন্য প্রশ্ন করে। সত্য-মিথ্যা নির্ণয়ের জন্য প্রশ্ন করে। তার আদিমতম কৌতূহল থেকে জন্ম নেয় প্রশ্নের। সে প্রশ্নগুলোর ডালপালা মেলে চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়। জানার কৌতূহলটা যদিও মানুষের আদিম কৌতূহলগুলোর একটি, তবুও সে কতটুকু জানছে আর কী জানছে তা নির্ভর করে সে কোথা হতে জানছে আর কার কাছ থেকে জানছে।

সঠিক প্রশ্ন নিয়ে সে যদি ভুল মানুষের কাছে যায়, তাহলে সে ভুল উত্তর পাবে আর ভুল জানবে। ভুল প্রশ্ন নিয়ে যদি সে সঠিক মানুষের কাছে যায়, তবুও সে সঠিক উত্তর পাবে। কারণ, সঠিক মানুষটা প্রথমে তার প্রশ্ন শুধরে দেবে। এরপর সেই প্রশ্নের উত্তর দেবে। সুতরাং শুধু প্রশ্ন করতে পারাটাই বাহাদুরি নয়, সেই প্রশ্নের উত্তরের জন্য কোথায় আর কার কাছে যাওয়া হচ্ছে সঠিক জ্ঞানার্জনের জন্য সেটাও অন্যতম একটা বিষয়।

আরজ আলী মাতুব্বর। জন্মেছেন বরিশাল। যখন থেকে উনার লেখার সাথে পরিচয়, তখন থেকে উনার যে বিশেষ গুণটি আমাকে খুব মুগ্ধ করেছে, তা হলো উনার প্রশ্ন করার ক্ষমতা। উনি প্রশ্ন করেছেন ধর্ম নিয়ে, ঈশ্বর নিয়ে। প্রশ্ন করেছেন আত্মা, পরকাল নিয়ে। ধর্মের সাথে দর্শন আর বিজ্ঞানের অসামঞ্জস্য নিয়েও বিস্তর আলাপ করেছেন। উনার প্রশ্ন করার এই ক্ষমতাকে আমি সাধুবাদ জানাই। কিন্তু উনি যে বিশেষ অ্যাঙ্গেল থেকে প্রশ্ন করে ধর্মকে, বিশেষ করে ইসলামধর্মকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন, সেই অ্যাঙ্গেলটা আসলে মূল ইসলাম না।

আগেই বলেছিলাম, প্রশ্ন করতে পারাটা সাধুবাদের। কিন্তু প্রশ্নের সোর্স যদি ভুল হয়, সঠিক উত্তরের আশা করাটা তখন বোকামিমাত্র। আরজ আলী মাতুব্বর সাহেবের ক্ষেত্রেও ঠিক তা-ই হয়েছে। উনি ভুল ইসলাম দিয়ে মূল ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। উনার জানা “ইসলাম” টা যে আসল ইসলাম নয়, সেটাই এই বইতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের দরবারে লাখো-কোটি শুকরিয়া এ জন্যই যে, প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ এর পরে তিনি আমাকে আরও একটি কাজ সমাপ্ত করার তাওফিক্ব দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

বইটি লিখতে গিয়ে আমাকে এমন কিছু বিষয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছে, যার সাথে উম্মাহর মাঝেই ইখতিলাফ তথা মতপার্থক্য আছে। এখন সেই বিষয়গুলো এড়িয়ে

যাওয়াটা কোনোভাবেই সম্ভব নয় বলে আমাকে নির্দিষ্ট একটা অবস্থান থেকে সেই বিষয়গুলোর ওপর আলোচনা করতে হয়েছে। আমার উদ্দেশ্য ছিল আরজ আলী মাতুব্বর সাহেবের সংশয়বাদী প্রশ্ন এবং যুক্তিগুলোর উত্তরপ্রদান, ইখতিলাফকৃত বিষয় নিয়ে উম্মাহর ঐক্য বিনস্ট করা কখনোই আমার উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং বইটি পড়তে গিয়ে কোনো পাঠক যদি এই বইয়ের কোনো কিছুকে উনার বিশ্বাস বা আক্বীদার সাথে আপাতবিরোধী পায়, তাহলে আমার অনুরোধ, তিনি যেন সেটাকে নিতান্তই ইখতিলাফ ভেবে বইয়ের মূল যে উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পাঠ করেন।

এই বইটিতে ভুলত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। বইতে যা কিছু ভুল তা একান্তই আমার পক্ষ থেকে। আর যা কিছু ভালো তা আল্লাহ সুবাহান ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে। রাব্বুল আ'লামীন আমাদের সিরাতুল মুস্তাক্বীমের পথে অটল, অবিচল থাকার তাওফিক্ব দান করুন, আ-মী-ন।

আরিফ আজাদ
arifazad.bd@outlook.com

শার'ঈ সম্পাদকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

মহান আল্লাহ আমাদের জীন ও মানব দু-ধরনের শয়তান থেকে একান্তভাবে তাঁর কাছে আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। শয়তানরা পথভ্রষ্ট করার জন্য দুটি অস্ত্র ব্যবহার করে থাকে। একটি হচ্ছে প্রবৃত্তির বাধাহীন চাহিদাপূরণের প্রতি উৎসাহপ্রদান, আরেকটি হচ্ছে মনের কন্দরে সন্দেহের বীজ বপন করা। আরজ আলী মাতুব্বর সাহেবদের কর্মকাণ্ডে প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয়টিই বেশি দেখা যায়। তারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল, আখেরাত, তাকদীর ইত্যাদি নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করে মানুষের ঈমান ও আমল বিনষ্ট করতে সচেষ্ট থাকে। তারা নিজেরা তাদের সন্দেহের ওষুধ গ্রহণ করে তা নিরাময় না করে অপরের দিকে সে সন্দেহ পাচার করে শান্তি পায়। আর এটাই চিরাচরিত নিয়ম যে রোগীরা সাধারণত সুস্থ মানুষকে ঈর্ষা করে। তারা যদি নিজেদের রোগ নিরাময় করতে পারত তবে নিজেরা যেমন শান্তি পেত অনুরূপভাবে অপর লোকদেরও শান্তি দিত। কিন্তু তারা বাঁকা পথটিই বেছে নিয়েছে। তাদের এসব সন্দেহের উত্তরের জন্য সত্যিকারের দীনী জ্ঞান থাকা যেমন জরুরি তেমনি দরকার আধুনিক কলা-কৌশল ও বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত প্রমাণাদি। দুটির সমন্বয়েই তা হয়ে উঠবে সোনায় সোহাগা।

'আরজ আলী সমীপে' গ্রন্থটির শার'ঈ দিকটি আমি দেখেছি। আমার কাছে মনে হয়েছে তাতে দুটি দিকই যথার্থভাবে স্থান পেয়েছে। যদি কুরআন ও সুন্নাহর সত্যিকারের অনুসরণের মাধ্যমে কোনো সন্দেহের উত্তর দেওয়া হয় তবে তা হয় যথার্থ। সুতরাং এ বইটির উত্তরসমূহ শার'ঈ ভিত্তির ওপর নির্ভর করে প্রদত্ত হয়েছে বলে আমি মনে করছি। আমার বিশ্বাস রয়েছে যে, এ গ্রন্থটি বাংলা-ভাষাভাষী সবার হাতে থাকা দরকার; যাতে করে আর কোনো আরজ আলী আমাদের সন্দেহের ধুম্রজাল সৃষ্টি করে ধোঁকা দিতে না পারে।

ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
অধ্যাপক, আল-ফিকহ অ্যান্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ
আইন ও শরী'আহ অনুষদ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

সূচিপত্র

ভূমিকার বিশ্লেষণ

আরজ আলী মাতুব্বর উনার লেখা সত্যের সন্ধান বইয়ের শুরুর দিকে বলেছেন,

> **"জগতে এমন অনেক বিষয় আছে, যেসব বিষয়ে দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম এক কথা বলে না।"**

প্রথমত, জগতের কোন কোন বিষয়ে দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম এক কথা বলে না তা আরজ আলী সাহেব উল্লেখ করেননি। দ্বিতীয়ত, জগতের কিছু কিছু বিষয়ে যে দর্শন, বিজ্ঞান আর ধর্ম এক কথা বলে না তা আসলে সত্য। সত্য এ কারণে যে, জগতের সকল বিষয়ে সমানভাবে দর্শন, বিজ্ঞান আর ধর্মকে কথা বলতে হয় না। আরজ আলী সাহেব যে ভুলটা শুরুতেই করে বসেছেন তা হলো, তিনি দর্শন, বিজ্ঞান আর ধর্মকে এক করে ফেলেছেন। অথচ, এ কথা স্বীকার্য যে, এই তিনটি বিষয়ের আলোচ্য বস্তু ভিন্ন ভিন্ন।

পদার্থ কী কী দিয়ে গঠিত তা বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। ধর্মে পদার্থের গঠনের সরাসরি কোনো পাঠ নেই। আবার, ব্যভিচার করলে কেন শাস্তি পাওয়া উচিত সে পাঠ ধর্মের, কোনো কোনো দর্শনে কিছু বলা থাকলেও, বিজ্ঞানে তার উত্তর নেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে ধর্ম, দর্শন আর বিজ্ঞানের বিষয়াদি এক নয়। এমতাবস্থায়, ভিন্ন ভিন্ন আলোচনার জিনিসকে একই বাটখারায় রেখে পরিমাপ করাটা নিতান্তই বোকামি।

একই পৃষ্ঠায় আরজ আলী সাহেব লিখেছেন :

> **"সাধারণত আমরা যাহাকে ধর্ম বলি তাহা হইলো মানুষের কল্পিত ধর্ম। যুগে যুগে মহাজ্ঞানীগণ এই বিশ্বসংসারের স্রষ্টা ঈশ্বরের প্রতি মানুষের কর্তব্য কী তাহা নির্ধারণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। 'স্রষ্টার প্রতি মানুষের কী কোন কর্তব্য নাই? নিশ্চয়ই আছে'—এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহারা ঈশ্বরের প্রতি মানুষের কর্তব্য কী তাহা নির্ধারণ করিয়া দিলেন। অধিকন্তু, মানুষের সমাজ ও কর্মজীবনের গতিপথও দেখাইয়া দিলেন সেই মহাজ্ঞানীগণ। এইরূপে হইলো কল্পিত ধর্মের আবির্ভাব।"**

আরজ আলী সাহেব উনার পুরো বইটি জুড়ে দর্শন, বিজ্ঞান আর যুক্তিবোধের জয়গান গাইলেও, বইয়ের শুরুতে কোনোরকম তথ্য, উপাত্ত, পরীক্ষালব্ধ প্রমাণাদি ছাড়াই দাবি করে বসলেন যে, ধর্মগুলো কথিত ধর্মগুরুদের বানানো। মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বেই যিনি নিজ বিশ্বাসের ওপর রায় দিয়ে ফলাফল জানিয়ে বসেন, তিনি আমাদের ঠিক কতটুকু "সত্যের সন্ধান" দিতে পারেন? ব্যাপারটা অনেকটা দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের মতো, যে প্রশাসন, মিডিয়া সবকিছু নিজের আয়ত্তে রেখে জনগণের উদ্দেশে ঘোষণা দেয়—"আসো, আজ আমি তোমাদের শেখাব সুষ্ঠু নির্বাচন কাকে বলে।" আরজ আলী সাহেবের অবস্থাও ঠিক দুর্নীতিগ্রস্ত সেই সরকারের মতো নয় কি?

মাতুব্বর সাহেব বলেছেন,

> **"হিন্দুদের নিকট গোময় (গোবর) পবিত্র, অথচ অহিন্দু মানুষ মাত্রেই অপবিত্র। পক্ষান্তরে মুসলমানদের নিকট কবুতরের বিষ্ঠাও পাক, অথচ অমুসলমান মাত্রেই নাপাক। পুকুরে সাপ, ব্যাঙ মরিয়া পচিলেও উহার জল নষ্ট হয় না, কিন্তু বিধর্মী মানুষ ছুঁইলেই উহা হয় অপবিত্র। কেহ কেহ একথা বলেন যে, অমুসলমানী পর্ব উপলক্ষ্যে কলা, কচু, পাঠা বিক্রিও মহাপাপ। এমনকি মুসলমানের দোকান থাকিতে হিন্দুর দোকানে কোনকিছু ক্রয় করাও পাপ। এই কী মানুষের ধর্ম? নাকি ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতা?"**

আরজ আলী সাহেব শুরুতেই হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ টেনেছেন, তা কতটুকু সত্য আমি জানি না। তবে হিন্দুধর্মের বর্ণপ্রথা সম্পর্কে কিছু ধারণা আছে

বৈকি! সে মতে উচ্চবর্ণের কোনো হিন্দু নিম্নবর্ণের কোনো হিন্দুর পাশ কাটিয়ে যাওয়াটাকেও পাপ মনে করে। এমনকি একটা সময়ে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পড়া দূরে থাক, ছোঁয়াটাও নিষিদ্ধ ছিল পুরোহিত কর্তৃক। পুরোহিত-তন্ত্রের এই বিধান এখনো হিন্দুধর্মে বলবৎ আছে কি না জানি না, তবে ভারতের অনেক জায়গায় এই রীতির এখনো চর্চা হতে পারে।

আরজ আলী সাহেব যে ভুলটা করেছেন তা হলো, তিনি হিন্দুধর্মের এই কালচারের সাথে ইসলামও গুলিয়ে ফেলেছেন। উনি বলেছেন, মুসলমানদের কাছে অমুসলমানমাত্রই নাপাক। কিন্তু ইসলামের দিকে তাকালে আমরা ঠিক এর বিপরীত চিত্রটাই দেখতে পাই।

আমরা সকলেই জানি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোটবেলাতেই বাবা-মা দুজনকে হারিয়েছিলেন। তখন থেকেই তিনি তাঁর আপন চাচা আবু তালিবের গৃহে বড় হন। চাচা আবু তালিব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের আপন ছেলের মতোই দেখাশুনা করেন। বড় করেন।

উল্লেখযোগ্য বিষয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা আবু তালিব কিন্তু মুশরিক ছিলেন। এমনকি মৃত্যুর আগমুহূর্ত পর্যন্তও তিনি ঈমান আনেননি। আরজ আলী সাহেবের মতে, ইসলামে অমুসলিমমাত্রই যদি অপবিত্র হবে, তাহলে ইসলামের সর্বশেষ নবীকে আল্লাহ তা'আলা চাচা আবু তালিবের বাসায় রেখে কেন বড় করে তুলবেন? একজন অপবিত্র লোকের সোহবতে? আশ্চর্য না ব্যাপারটা?

এমনও প্রমাণ পাওয়া যায়, চাচা আবু তালিবের মৃত্যুশয্যায় উনার পাশে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত ছিলেন এবং উনাকে কালেমা পাঠ করার জন্য অনুরোধ করেন। এখন, ইসলামে অমুসলিম ব্যক্তিমাত্রই যদি অপবিত্র হয়, নাপাক হয়, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে উনার চাচা, যিনি একজন মুশরিক ছিলেন, তার নিকট অবস্থান করেন?

মূলত আরজ আলী সাহেব এই জায়গায় এসে যে ভুলটা করেছেন সেটা হলো, ইসলামের পাক-নাপাকের যে কনসেপ্ট, সেই কনসেপ্টে ভদ্রলোক গুলিয়ে ফেলেছেন।

পবিত্র কুরআনে মুশরিকদের যদিও অপবিত্র ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হচ্ছে,

"হে মুমিনগণ, মুশরিকরা অপবিত্র। কাজেই তারা যেন এ বছরের পর আর কখনোই মসজিদুল হারামের কাছে না আসতে পারে।[১]"

আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, এখানে মুশরিকরা অপবিত্র বলতে তাদের শারীরিক অপবিত্রতার কথা বোঝানো হচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটা আসলে তা নয়। এখানে যে 'অপবিত্রতা'-এর কথা বলা হয়েছে তা শারীরিক নয়; বরং আত্মিক। এবং সকল প্রসিদ্ধ তাফসীরে এই কথাটাই জোরালোভাবে বলা হয়েছে। যেমন : তাফসীরে মা'রেফুল কুরআনে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে,

"আসলে এখানে দৈহিক নয়; বরং আত্মিক অপবিত্রতার কথাই বলা হচ্ছে। তাদের শরীর নোংরা, একথা বলা হয়নি। এটা কুরআনের বিশেষ বাচনভঙ্গি।[২]"

এখন প্রশ্ন আসতে পারে, আত্মিক অপবিত্রতাটাই আবার কী রকম? আর মুশরিকরা কেন আত্মিকভাবে অপবিত্র? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের জানতে হবে ইসলামের একেবারে গোড়ার কনসেপ্ট। ইসলাম যে মূল ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে আছে সেটা হলো তাওহীদ। 'তাওহীদ' শব্দের অর্থ : 'একত্ববাদ'।

ইসলামে একমাত্র উপাস্য আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা। এর বাইরে আর দ্বিতীয় কোনো উপাস্য ইসলামে নেই। আল্লাহর বাইরে অন্য কারও ইবাদাত করা ইসলামে সর্বোচ্চ পর্যায়ের পাপ। এটা এমন পর্যায়ের পাপ, যার কোনো ক্ষমা নেই। ইসলামে আল্লাহই যে একমাত্র উপাস্য সত্তা, কুরআনের বহু জায়গায় তার উল্লেখ আছে। যেমন :

"তাঁর কোনো শরীক নেই।[৩]"

---

১ সূরা আত-তাওবা (০৯) :২৮
২ তাফসীরে মা'রেফুল কুরআন, সূরা তাওবা (০৯) : ২৮
৩ সূরা আল-আন'আম (০৬) : ১৬৩

"তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।[১]"

ইসলামে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে সাহায্য চাওয়াও শির্কের পর্যায়ভুক্ত। যেমন : সূরা ফাতিহায় বলা হচ্ছে,

"আমরা তোমারই ইবাদাত করি আর কেবল তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।[২]"

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইসলামে একমাত্র উপাস্য কেবল আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা। তাঁর বাইরে অন্য কারও পূজা, ইবাদাত করা ইসলামে হারাম ও শির্ক। কিন্তু মুশরিকদের ধর্মীয় নিয়ম তার উল্টো। মুশরিকরা একই সাথে অনেক দেব-দেবীর পূজা করে। তাওহীদের যে কনসেপ্ট, তার একেবারে বিপরীত তাদের অবস্থান।

ইসলামের দৃষ্টিতে যারা তাওহীদবাদী, যারা কেবল আল্লাহকেই একমাত্র উপাস্য হিসেবে মানে, যারা কেবল আল্লাহরই ইবাদাত করে, তারা মনের দিক থেকে পবিত্র। আর যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য অনেকগুলো দেব-দেবীর পূজা করে, উপাস্য জ্ঞান করে, তারা মনের দিক থেকে অপবিত্র। এমতাবস্থায় হারাম শরীফের মতো মুসলিমদের পবিত্র জায়গায় একই সাথে তাওহীদবাদী এবং মুশরিকদের অবস্থান থাকতে পারে না। তাই কুরআন মুশরিকদের আত্মিক দিক থেকে অপবিত্র ঘোষণা করে বায়তুল হারামে তাদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু এটাকে আরজ আলী সাহেব শারীরিক অপবিত্রতার সাথে গুলিয়ে বলেছেন, "অমুসলমান ছুঁইলেই ইহা অপবিত্র হয়।"

মুশরিকদের যদি শারীরিকভাবে অপবিত্র ঘোষণা করা হতো, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই চাচা আবু তালিবের সাথে এ রকম মেলামেশা করতেন না। তিনি অবশ্যই অমুসলিমদের সাথে চুক্তি করতেন না। এ ছাড়াও, ইসলামের ইতিহাস ঘাঁটলে এ রকম অনেক প্রমাণ পাওয়া যাবে, যেখানে মুসলিমরা অমুসলিমদের সাথে বসবাস করত, ব্যবসা-বাণিজ্য করত। এমনকি ইসলামের

---

১ সূরা ইখলাস (১১২) : ০৪
২ সূরা ফাতিহা (০১) : ০৪

ইতিহাসের অন্যতম যে ঘটনা, "মদিনা সনদ"ই তো করা হয়েছে ইয়াহূদীদের সাথে।

আরজ আলী সাহেব বলেছেন, ইসলামে নাকি মুসলমানদের দোকান থাকতে হিন্দুর দোকান থেকে কোনো কিছু ক্রয় করাও পাপ। এই ফতোয়াটাও আরজ আলী সাহেব ঠিক কোথায় পেয়েছেন বা কার কাছে শুনেছেন আমি জানি না। তবে, ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ আল বুখারীতে উল্লেখ করেছেন,

> *আবদুর রহমান ইবন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, 'আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলাম। তখন এক মুশরিক ব্যক্তি তার কিছু ভেড়াসহ আমাদের কাছে এল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'এগুলো কি বিক্রির জন্য নাকি হাদিয়ার জন্য?' এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজের জন্য ওই ব্যক্তির কাছ থেকে একটি ভেড়া ক্রয় করে নিলেন।*[১]

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আরজ আলী সাহেব 'অমুসলিম ব্যক্তিমাত্রই নাপাক, তাদের কাছ থেকে কিছু কেনাও যাবে না' মর্মে ইসলামের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ দাঁড় করিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। বরং আমরা জানলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যক্তিজীবনে অমুসলিম পরিবারে বড় হয়েছেন, অমুসলিমদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন, চুক্তি করেছেন, ক্রয়-বিক্রয় করেছেন। এতৎসত্ত্বেও, ইসলামের বিরুদ্ধে এ রকম ভিত্তিহীন, বানোয়াট, মনগড়া অভিযোগ আনার হেতু কী তা কি আরজ আলী সাহেবের ভক্তকুল আমাদের জানিয়ে বাধিত করবেন?

আরজ আলী মাতুব্বর অভিযোগ তুলেছেন এই মর্মে যে, ধর্ম নাকি জ্ঞান অর্জনে বাধা প্রয়োগ করে। তিনি বলেছেন,

> **"এই যে জ্ঞানের অগ্রগতিতে বাধা, মনের অদম্য স্পৃহায় আঘাত, আত্মার অতৃপ্তি, ইহারই প্রতিক্রিয়া—মানুষের ধর্মকর্মে শৈথিল্য। এক কথায়—মন যাহা চায় ধর্মের কাছে তাহা পায় না। মানুষের মনের ক্ষুধা অতৃপ্তই থাকিয়া যায়। ক্ষুধার্ত বলদ**

১ সহীহ আল বুখারী, ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়, হাদীস : ২২১৬

> **যেমনি রশি ছিড়িয়া অন্যের ক্ষেতের ফসলে উদর পূর্তি করে, মানুষের মনও তেমন ধর্ম ক্ষেত্রের সীমা অতিক্রম করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য ছুটিয়া যায় দর্শন আর বিজ্ঞানের কাছে।"**

আরজ আলী সাহেবের এই কথাগুলো মোটাদাগে অন্য ধর্মের সাথে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ বলতে পারি না, কিন্তু ইসলামের সাথে এর ছিটেফোঁটা সম্পর্কও নেই।

হিন্দুধর্মে একটা সময়ে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা তাদের ধর্মগ্রন্থ স্পর্শও করতে পারত না। শুধু ব্রাহ্মণরাই পুজো-অর্চনা, উপাসনা করতে পারত। খ্রিষ্টধর্মের চার্চ কর্তৃক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের ওপর খড়্গহস্তে নেমে পড়ার কাহিনিও সবার জানা। কিন্তু ইসলামের ইতিহাসে এ রকম কোনো ঘটনা নেই যেখানে ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে; বরং ইসলাম বরাবরই জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় উদ্বুদ্ধ করে এসেছে। বিজ্ঞানে মুসলিমদের অবদান সর্বজনবিদিত। চিকিৎসাবিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞানে মুসলিম বিজ্ঞানীদের রয়েছে অভূতপূর্ব অবদান। অন্ধকার ইউরোপে সর্বপ্রথম আলোকবর্তিকা হাতে ইসলাম প্রবেশ করেছে। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য—সবখানে মুসলিমদের ছিল জয়জয়কার।

আল-কুরআনে জ্ঞানার্জনের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আল-কুরআন নাজিলের প্রথম যে শব্দ, সেই শব্দ ছিল—পড়ো। যে জানে এবং যে জানে না তাদের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে কুরআন বলেছে—

"যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি কখনো সমান হতে পারে?[১]"

সুন্দর একটি পার্থক্য টেনে কুরআন বুঝিয়ে দিলো যে, যারা জানে তারা উত্তম তাদের চেয়ে, যারা জানে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"

প্রত্যেক মুসলিমের জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফরয।[২]

---

১ সূরা আয যুমার (৩৯) : ০৯
২ ইবনু মাজাহ, হাদীস : ২২৪; মিশকাত, হাদীস : ২১৮

ইসলামের ইতিহাসের দিকে তাকালে এমন বহু মুসলিম বিজ্ঞানীর নাম আমরা দেখতে পাই যারা তাদের কর্মের মাধ্যমে বিজ্ঞান, দর্শনজগতে অবদান রেখেছিলেন। তাদের নাম সারা বিশ্বের মানুষ স্মরণ রেখেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় মুসলিমদের অবদানের কথা স্বীকার করতে গিয়ে বর্তমান সময়ের বিখ্যাত নাস্তিক রিচার্ড ডকিন্স একবার টুইট করেছিলেন এই বলে : "1000 years ago, the Islamic golden age embraced all the world's learning, books & science. Can we have a new Islamic golden age, please?[১]"

নাস্তিকরাও একথা অকপটে স্বীকার করে যে, ইসলাম কখনোই জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার বিরুদ্ধে ছিল না; বরং জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সম্প্রসারিত করার জন্য ইসলাম যা করেছে, পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্ম তা করেনি। তা ছাড়া, ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের যে দ্বন্দ্বের কথা আরজ আলী সাহেব উল্লেখ করেছেন, তা কতটুকু সত্য, যেখানে ফ্রান্সিস বেকন, কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, আইনস্টাইন এবং নিউটনের মতো বিজ্ঞানীরা ধর্ম এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন?

আরজ আলী সাহেব লিখেছেন,

> **"অধিকাংশ ধর্ম এবং ধর্মের অধিকাংশ তথ্য অন্ধবিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত।"**

এবার অবশ্য আরজ আলী সাহেব ঠিক কথা বলেছেন। ধর্মের কিছু তথ্য অবশ্যই বিশ্বাসের ওপরে নির্ভর করে, যেমন : আল্লাহতে বিশ্বাস, জান্নাত-জাহান্নামে বিশ্বাস, আখেরাত, ফেরেশতা ইত্যাদিতে বিশ্বাস। একজন মুসলিম এ সবকিছু না দেখেই বিশ্বাস করে। পবিত্র কুরআনের শুরুতেই বলা হয়েছে,

"যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে।[২]"

ঈমানের মূল হচ্ছে গায়েবে বিশ্বাস। এমন কিছুতে বিশ্বাস করা যা দেখা যাচ্ছে না, ধরা যাচ্ছে না, ছোঁয়া যাচ্ছে না। মানুষ চাইলেই পৃথিবীতে বসে আল্লাহকে দেখতে পাবে না। সে চাইলেই জান্নাত-জাহান্নাম অবলোকন করতে পারবে না।

---

১ https://twitter.com/richarddawkins/status/678074638119882752?lang=en
২ সূরা বাকারা (০২) : ০৩

ফেরেশতাদের সাথে মতবিনিময় করতে পারবে না। সে পারবে না, কারণ—সে কিছু সীমাবদ্ধতার মধ্যে বন্দী। সেটা কী রকম?

সেটা হচ্ছে মানুষ সময়ের বাইরে কল্পনা করতে পারে না। সে সময়ের ফ্রেমে বন্দী। সে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ এই তিন ফ্রেমের মধ্যে বন্দী পাখির মতো। সে চিন্তা করতে পারে অতীতে কী হয়েছিল তা নিয়ে। সে চিন্তা করতে পারে আজ কী হচ্ছে তা নিয়ে। সে চিন্তা করতে পারে আগামীকাল কী হতে পারে তা নিয়ে। কিন্তু এই অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের বাইরে এসে কোনো কিছুই সে কল্পনা করতে পারে না। কারণ, সে টাইম-ফ্রেমের মধ্যে বন্দী। কিন্তু বাই ডেফিনেইশান, স্রষ্টা কোনো টাইম-ফ্রেমে বন্দী নন। তিনি ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সবকিছুর ঊর্ধ্বে।

মানুষের সীমাবদ্ধতার দরুন সে বাহ্যিক জগতেও অনেক কিছু দেখতে পায় না, অনেক কিছু শুনতে পায় না। যেমন ধরুন মানুষের চোখ। সাধারণত ৩৯০ থেকে ৭০০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো মানুষ দেখতে পারে। এরচেয়ে কম বা এরচেয়ে বেশি আলো মানুষ দেখতে পারে না। কেন পারে না? এটা মানুষের সীমাবদ্ধতা।

আবার ধরুন মানুষের কান। সাধারণত 20Hz–20,000Hz এর মধ্যে থাকলেই কেবল আমরা শব্দ শুনতে পাই। এরচেয়ে কম বা বেশি হলে সেই শব্দ আমরা শুনতে পাই না। কেন শুনতে পাই না? আমাদের সীমাবদ্ধতা।

এত এত সীমাবদ্ধতা নিয়ে আমরা কীভাবে আশা করি যে স্রষ্টা আমাদের ল্যাবের অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে এসে ধরা দেবেন? মানুষকে স্রষ্টা এই ক্ষমতা দেননি। এ জন্য তিনি বলেছেন তাকে না দেখে বিশ্বাস করতে হবে। তবে কি মানুষ কখনোই স্রষ্টাকে দেখবে না? অবশ্যই দেখবে। তবে সেটা নির্দিষ্ট সময়ে। সেটি কোন সময়? আখেরাত।

কড়া বা হালকা বিজ্ঞানমনস্করা এতটুকু পড়ে হয়তো-বা আমাকে দু-চারবার মনে মনে গালমন্দ করে ফেলেছেন। বলছেন, 'না দেখে আবার বিশ্বাস কী!'

বিজ্ঞানকে যারা দেখে বিশ্বাস করতে অভ্যস্ত অথবা যারা যারা Seeing is believing তত্ত্বানুরাগী, তাদের জন্য আমাদের কাছে রয়েছে মহা দুঃসংবাদ। দুঃসংবাদটি হলো, বিজ্ঞান নিজেও এখন আর Seeing is believing তত্ত্বে বিশ্বাস করে না। কারণ, এতদিন ধরে যারা 'মহাবিশ্বকে জেনে ফেলেছি, বুঝে ফেলেছি' বলতে বলতে তৃপ্তির ঢেকুর তুলতেন, তাদের জন্য ভয়ংকর দুঃসংবাদ শোনাচ্ছে

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'নাসা'।

তারা বলছে, এতদিন ধরে, এত বছর শ্রমসাধনা করে আমরা মহাবিশ্বের যতটুকু জেনেছি সেটার পরিমাণ খুবই ক্ষুদ্র। NASA স্পষ্ট করে জানাচ্ছে, আমাদের এই জানার পরিমাণ মাত্র ৫ % এরও কম। বাকি ৯৫ % তাহলে কী? বাকি ৯৫ % হলো ডার্ক ম্যাটার বা 'অদৃশ্য বস্তু'। এই ৯৫ % অদৃশ্য বস্তু নিয়েই আমাদের সমগ্র মহাবিশ্ব পরিবেষ্টিত। কিন্তু এই অদৃশ্য বস্তুগুলোকে আমরা বুঝতে পারছি না। দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের শত শত বছরের উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করেও আমরা জানতে পারছি না এই অদৃশ্য বস্তু আসলে কী আর এখানে কী হয়।

NASA-এর বিজ্ঞানীরা বলছে, 'More is unknown than is known. No one expected this, no one knew how to explain it. But something was causing it. It is a complete mystery. But it is an important mystery.'

তাদের মতে, 'এটা যতটুকু না জানা গেছে তারচেয়ে বেশি অজানা।'

তাহলে, এই অজানা বস্তুকে আমরা কী করব? বিজ্ঞানীরা কী করবেন? পদার্থবিজ্ঞানীরা কী করবেন? এগুলোকে অস্বীকার করবেন? 'নাই নাই' বলে পাশ কাটবেন? একদম না। বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিতে হলে তাদের এই বিশাল পরিমাণ অদৃশ্য বস্তুকে 'বিশ্বাস' করে আগাতে হবে। ধরে নিতে হবে যে—'আছে। এরা আছে।'

ব্যাপারটাকে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন ডক্টর জাফর ইকবাল। মানুষ যে আদতে প্রকৃতির সব রহস্য ভেদ করতে পারবে না, তা এখনকার বিজ্ঞান অকপটে স্বীকার করে। অধ্যাপক জাফর ইকবাল তাঁর লেখা *কোয়ান্টাম মেকানিক্স* বইতে লিখেছেন,

"কাজেই যারা বিজ্ঞান চর্চা করে তারা ধরেই নিয়েছে আমরা যখন বিজ্ঞান দিয়ে পুরো প্রকৃতিটাকে বুঝে ফেলবো, তখন আমরা সবসময় সবকিছু সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবো। যদি কখনো দেখি কোনো একটা কিছু ব্যাখ্যা করতে পারছি না, তখন বুঝতে হবে এর পেছনের বিজ্ঞানটা তখনো জানা হয়নি। যখন জানা হবে তখন সেটা চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবো। এককথায়, বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা বা ভবিষ্যদ্বাণী সবসময়েই নিখুঁত এবং এবং সুনিশ্চিত, কোয়ান্টাম মেকানিক্স বিজ্ঞানের এই ধারণাটাকে পুরোপুরি পাল্টে দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করেছেন যে, প্রকৃতি আসলে কখনোই সবকিছু জানতে দেবে না। সে তার ভিতরের কিছু কিছু

জিনিস মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে। মানুষ কখনোই সেটা জানতে পারবে না। সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপার হচ্ছে, এটা কিন্তু বিজ্ঞানের অক্ষমতা বা অসম্পূর্ণতা নয়। এটাই হচ্ছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানীরা একটা পর্যায়ে গিয়ে কখনোই আর জোরগলায় বলবেন না 'হবে', তারা মাথা নেড়ে বলবেন—'হতে পারে'।[১]"

অধ্যাপক জাফর ইকবালের কথার সারমর্ম এই যে, বিজ্ঞানীরা কোনোদিনও প্রকৃতির সকল রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারবেন না। এই না পারাটা কি বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানীদের অক্ষমতা? জাফর ইকবাল বলছেন, 'না। এটা বিজ্ঞানের অক্ষমতা বা সীমাবদ্ধতা নয়; বরং এটাই বিজ্ঞানের ধর্ম।' বিজ্ঞানীরা আর উঁচু গলায় বলতে পারবেন না যে—'হবে' । তাদের বলতে হবে—'হতে পারে'।

এই হচ্ছে বিজ্ঞানের অবস্থা। এই যে প্রকৃতির কিছু রহস্য বিজ্ঞান উদ্ঘাটন করতে পারছে না বা পারবে না, তার মানে কি আমাদের ধরে নিতে হবে যে এগুলোর অস্তিত্ব নেই? নাহ। বিজ্ঞান মোটেও তা বলে না। বিজ্ঞান সেই না-জানা, না-দেখা, না-বুঝতে পারা রহস্যতেও ঈমান আনে। বিশ্বাস করে। বিজ্ঞান এভাবেই আগায়। বিজ্ঞানকে এভাবেই আগাতে হয়। সুতরাং আরজ আলী সাহেবের মতে শুধু ধর্মই 'বিশ্বাস' নিয়ে আগায় না, তাদের পরম পূজিত বিজ্ঞানও আধুনিককালে এত্তোগুলো ঈমান নিয়ে চলে। এই ঈমান ছাড়া তারা এগুতে পারে না।

এই অধ্যায়ের শেষের দিকে আরজ আলী সাহেব আরও মজার বিষয়ের অবতারণা করেছেন। তিনি লিখেছেন,

> **"আজকাল যেখানে-সেখানে শোনা যাইতেছে যে, সংসারে নানা প্রকার জিনিসপত্র হইতে 'বরকত' উঠিয়া গিয়াছে। কারণ লোকের আর পূর্বের মতো ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাস নাই। পূর্বে লোকের ঈমান ছিলো, ফলে তাহারা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিতো। আর আজকাল মানুষের ঈমান নাই। তাই তাহাদের অভাব ঘোচে না। ঈমান নাই বলিয়াই ক্ষেতে আর সাবেক ফসল জন্মে না। ফলের গাছে ফল ধরে না। পুকুরে-নদীতে মাছ পড়ে না। ঈমান নাই বলিয়াই মানুষের ওপর গজবরূপে কলেরা, বসন্ত, বন্যা-বাদল, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি নানা প্রকার বালা-মুছিবত নাজেল**

---

১ কোয়ান্টাম মেকানিক্স, মু. জাফর ইকবাল, পৃষ্ঠা : ১০

হয়। অথচ মানুষের হুঁশ হয় না। এইরূপ যে নানা প্রকার অভাব-অভিযোগের জন্য ঈমানের অভাবকেই দায়ী করা হয়, তাহা কতোটুকু সত্য?"

আরজ আলী সাহেবের বক্তব্য হলো, মুসলিমগণ বিশ্বাস করে যে, ঈমান কমে গেলে আয়-রোজগার, সাংসারিক জিনিসপত্রাদি থেকে 'বরকত' উঠে যায়। আরজ আলী সাহেবের এই কথা শুনে আমার দাদির কথা মনে পড়ে গেল। আমার দাদি ছিলেন অশিক্ষিত, অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন এক গ্রাম্য মহিলা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তো ছিলই না, আমার দাদি যে অন্ততপক্ষে স্বশিক্ষিত ছিলেন, এমনটাও না। ছোটবেলায় দাদির কাছে ঠিক এ রকম গল্পই শুনতাম আমরা। মানুষের ঈমান চলে যাচ্ছে বলেই সংসারের আয়-রোজগারে ভাটা পড়ছে, রোগে-শোকে ধরছে। দাদির মতে, এসবের পেছনে একটাই কারণ—ঈমানের ঘাটতি।

কিন্তু বড় হয়ে যখন আমি ধর্মতত্ত্ব পড়া শুরু করলাম, ধর্মীয় বইপত্র অধ্যয়ন শুরু করলাম, সবিস্ময়ে লক্ষ করলাম, এতদিন দুঃখ-দুর্দশা আর আয়-রোজগার থেকে বরকত উঠে যাওয়ার জন্য ঈমানের যে ঘাটতিকে দায়ী করা হচ্ছিল, তা সম্পূর্ণ বিপরীত।

আমি যতদূর জানি, আরজ আলী মাতুব্বর সাহেবেরও কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। কিন্তু তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত। নিজে নিজে অনেকদূর পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন। শোনা যায়, বরিশাল বি.এম কলেজের পাঠাগারে থাকা মোটা মোটা দর্শন, বিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যা আর ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন ভদ্রলোক। এতৎসত্ত্বেও, কেন তিনি মফস্বলে অশিক্ষিত মানুষগুলোর লোকমুখে প্রচলিত কিছু কুসংস্কারকে ইসলামের সাথে বেঁধে দিয়ে প্রশ্ন ছুড়েছেন, সেটাই আমি বুঝতে পারছি না।

তাঁর মতে, মুসলিমদের বিশ্বাস হলো, ঈমান দুর্বল হলে সংসারের আয়-বরকত কমে যায়। আমার প্রশ্ন হলো, এই জগৎ-সংসারে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরচেয়ে বেশি ঈমানদার, বেশি পরহেযগার, বেশি তাকওয়াবান, বেশি আমলকারী লোক আর কেউ ছিল কি? যদি না থাকে, তাহলে এই সর্বোচ্চ ঈমানদার, সর্বোচ্চ পরহেযগার, সর্বোচ্চ তাকওয়াবান, সর্বোচ্চ আমলকারী ব্যক্তির ঘরে কেন এক দিন চুলোয় আগুন জ্বললে চার দিন জ্বলত না? কেন তাঁকে খেজুর পাতার চাটাইয়ে শুতে হতো, যার ফলে তাঁর পিঠে, হাতে, ঘাড়ে দাগ পড়ত? তাঁর কি ঈমানের ঘাটতি ছিল? যদি না থাকে তাহলে কেন তাঁকে অনাহারে থাকতে হতো? কেন নবীনন্দিনী ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর পুত্রদের খেতে দিতে পারতেন না?

তাহলে দেখা যাচ্ছে, রুযী-রোজগার বৃদ্ধি-ঘাটতি সব সময় ঈমানের ওপর নির্ভর করে না, আর অভাব-অনটন, দুর্দশা ইত্যাদিও সর্বদা দুর্বল ঈমানের ফল নয়। বরং অভাব-অনটন, দুঃখ-দুর্দশা ইত্যাদি হলো মজবুত ঈমানের ফল। যার ঈমান যত পাকাপোক্ত, তার জন্য পরীক্ষাও তত বেশি, তত কঠিন। যার জ্বলন্ত উদাহরণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন,

“

"দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা এবং কাফেরদের জন্য জান্নাতের মতো।[১]"

জেলখানা কেমন? খুব কি আরামের জায়গা? নাকি কষ্টের? অবশ্যই জেলখানা কষ্টের জায়গা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনদের জন্য দুনিয়াকে সেই কষ্টের জায়গা 'জেলখানার' সাথে তুলনা করেছেন। আর জান্নাত কেমন? জান্নাত হচ্ছে আরামদায়ক জায়গা। যেখানে কষ্ট নেই, দুঃখ নেই, ক্লান্তি নেই, অভাব-অনটন কিচ্ছু নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের জন্য দুনিয়াকে জান্নাতের সাথেই তুলনা করেছেন।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে, দুনিয়ায় যে যত বেশি ঈমানদার, সে তত বেশি পরীক্ষার মধ্যে থাকবে। দুঃখ-কষ্টের পরীক্ষা, রোগ-শোকের পরীক্ষা ইত্যাদি। আর যার ঈমান নেই, তার পরীক্ষা কম। সে সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে। তাহলে এখান থেকে আমরা দেখতে পেলাম, ইসলামী বিশ্বাস হিসেবে 'ঈমান দুর্বল থাকলে বা কমে গেলে বরকত উঠে যায়' মর্মে যে তত্ত্ব আরজ আলী সাহেব আমাদের গিলাতে চেয়েছেন, তার সাথে মূল ইসলামের ছিটেফোঁটা সম্পর্কও নাই; বরং আসল কাহিনি আরজ আলী যা বলেছেন তার বিপরীত।

এ জন্য দুনিয়ার সামগ্রী সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টভঙ্গি হচ্ছে, তা ধোঁকার সামগ্রী। এটা দিয়েও আল্লাহ কাউকে পরীক্ষা করেন, আবার না দিয়েও পরীক্ষা করেন। ভালো-মন্দ উভয় অবস্থাই ঈমানদারের জন্য পরীক্ষার বিষয়। যেমন কুরআনে বলা হচ্ছে,

'আর আমি পরীক্ষা করি সুখ এবং দুঃখ দিয়ে যাতে তারা ফিরে আসে।[২]'

---

১ সহীহ মুসলিম, ২৯৫৬
২ সূরা আল-আ'রাফ (০৭) : ১৬৮

বরং আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে যদি সব মানুষ কাফের হওয়ার আশঙ্কা না থাকত তাহলে তিনি কাফেরদের ঘর-বাড়ি স্বর্ণ-রৌপ্য দিয়ে মুড়িয়ে দিতেন। কিন্তু তিনি দুনিয়াতেও তাদের পরিমিত প্রদান করেন।[১] তবে কখনো কখনো ঈমান ও তাকওয়া থাকলে আল্লাহ তার আকাশস্থিত বরকত ও যমীনস্থ প্রভূত কল্যাণের দ্বার উন্মোচন করেন বলে ঘোষণা করেছেন।[২] সেটাও মূলত পরীক্ষা। সুতরাং ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এসবকে ঈমানদার পরীক্ষার সামগ্রী হিসেবেই গ্রহণ করে। কাউকে ধন-সম্পদ দিলে তাকে ভালোবাসার প্রমাণ যেমন নয়, তেমনি না দিলে ভালো না-বাসার প্রমাণও তা নয়। কাফের মুশরিকরাই শুধু দুনিয়ার জীবনের প্রাচুর্যকে স্রষ্টার ভালোবাসার নমুনা হিসেবে গ্রহণ করে থাকে।[৩]

ঈমানদারের দৃষ্টি আখেরাতের দিকে হওয়ার কারণে সে প্রাচুর্য দেখলে সর্বদা ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে, না জানি তার আখেরাতের হিসাব শূন্য হয়ে গেল! পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হচ্ছে,

কেউ পার্থিব সুখ সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা সত্বর দিয়ে থাকি; পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি যেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত এবং অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত অবস্থায়।[৪]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম[৫] এবং আমাদের পূর্বসূরি সাহাবায়ে কিরামও এমনটি বলেছেন।[৬]

ইসলামের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ টানার পরে তিনি চীন, রাশিয়াসহ প্রভৃতি উন্নত দেশের উদাহরণ টেনে বোঝাতে চাইলেন, এই সমস্ত দেশের মানুষের কোনো ধর্ম নেই। থাকলেও তারা আল্লা-বিল্লা করে না। তথাপি, তাদের সংসার সোনায় সোহাগা। তাদের ব্যাংক-ব্যালেন্স ভর্তি টাকা-পয়সা, ইয়া বড় বড় অট্টালিকা। তাদের দেশে রোগ-শোক কম। টাইফয়েড, কলেরার মতো মহামারি অনেক আগেই সেখান থেকে তল্পি-তল্পা নিয়ে বিদেয় হয়েছে। অথচ আমাদের দেশের মতো যে সকল

১ সূরা আয-যুখরুফ (৪৩) : ৩৩
২ সূরা আল-আ'রাফ (০৭) : ৯
৩ সূরা সাবা (৩৪) : ৩৫
৪ সূরা আল-ইসরা (১৭) : ১
৫ বুখারী : ২৪৬৮
৬ বুখারী : ১২৭৪, ১২৭৫

গরিব দেশের মানুষ আল্লা-বিল্লা করে, তারা কেন গরিব হবে? তাদের কেন না খেয়ে মরতে হবে? তাদের কেন বাড়ি নেই, গাড়ি নেই? এই সকল দেশে কেন কলেরা-টায়ফয়েডের মতো রোগ মহামারিরূপে দেখা দেবে?

আরজ আলী উনার সেই আগের ভুলের বৃত্তেই ঘুরপাক খাচ্ছেন। উনি মনে করেছেন আল্লা-বিল্লা করলে আর পাক্কা মুমিন হলেই বুঝি আকাশ থেকে টাকার বস্তা ধপাস করে উঠোনে এসে পড়ে!

আরজ আলী সাহেবদের এসব অভিযোগ পুরোনো। আজ থেকে ১৪০০ বছর আগের কাফেররাও এই প্রশ্নগুলো করত। তাদের প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"কাফিরদের নিকট পার্থিব জীবনকে মোহনীয় করা হয়েছে। ফলে তারা মুমিনদের বিদ্রুপ করে থাকে। বস্তুত কিয়ামতের দিন মুত্তাকীগণ তাদের চেয়ে উন্নত অবস্থায় থাকবে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দিয়ে থাকেন।[১]"

আল্লাহ বলছেন, যারা কাফের, তাদের সামনে তিনি দুনিয়াকে মোহনীয় করে দিয়েছেন। ফলে দুনিয়ালাভের প্রতিযোগিতায় তারা বিভোর। এতই বিভোর যে, মুত্তাকীদের উদ্দেশে তারা এই আরজ আলী সাহেবদের মতো বিদ্রুপাত্মক প্রশ্ন করে, 'তোমরা তো খুব আল্লা-বিল্লাহ করো; কই, তোমাদের কষ্ট তো লাঘব হয় না? অথচ আমরা এর কিছুই করি না। দেখো, আমরা কত সুখে আছি।'

আল্লাহ পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন, 'বস্তুত কিয়ামতের দিন মুত্তাকীগণ তাদের চেয়ে উন্নত অবস্থায় থাকবে।' অন্য আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরও সুস্পষ্ট করে বলছেন,

"নিশ্চয়ই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব ভয়, ক্ষুধা, ধন-সম্পদ, জীবন ও ফসলাদির ক্ষয়ক্ষতির মাধ্যমে। অতএব (হে রাসূল), আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ প্রদান করুন।[২]"

---

১ সূরা বাক্বারা (০২) : ১১২
২ সূরা বাক্বারা (০২) : ১৫৫

সুতরাং এই আয়াত থেকেও এটা সুস্পষ্ট যে, ভয়-ক্ষুধা-মৃত্যু-জীবন আর ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি কখনোই দুর্বল ঈমানের কারণ নয়; বরং তা আল্লাহর কাছ থেকে ঈমানদারদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ।

আরজ আলী সাহেবেরা যে ইসলামকে রিপ্রেজেন্ট করে ইসলামকে একহাত নেওয়ার চেষ্টা করে, সেই ইসলাম গ্রামের কুসংস্কার বৈ কিছু নয়। আসল ইসলামের সাথে এর দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু সেই কুসংস্কারকে লক্ষ্যবস্তু ধরে আরজ আলী সাহেবেরা যখন ধর্মতর্কে আসেন, তখন আমরা সেটাকে নিছক ছেলেমানুষি ছাড়া কীই-বা বলতে পারি?

এ রকম আরও অনেক হাস্যকর যুক্তি তর্ক আমরা সামনে দেখতে পাব। এই অধ্যায়ের শেষে উনি আরও যে কয়টি হাস্যকর তথ্য ইসলামের নামে ছুড়ে দিয়েছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

তিনি লিখেছেন,

> **"বলা হয় যে, আল্লাহর অসাধ্য কোনো কাজ নাই। বিশেষ বিশ্বাসী ভক্তদের অনুরোধে তিনি অসম্ভবকেও সম্ভব করেন। সোলায়মান নবী নাকি সিংহাসনে বসিয়া সপরিষদ শূন্যে ভ্রমণ করিতেন। তাই বলিয়া 'আল্লাহ তা'লা ইচ্ছা করিলে জায়নামাজশুদ্ধ আমাকেও নিমেষের মধ্যে মক্কায় পৌঁছাইতে পারেন'—এইরূপ বিশ্বাস কোনো পীর সাহেবের আছে কি? থাকিলে একবারও তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন কি? না দেখিয়াই বা উড়োজাহাজে চড়িবার কারণ কী? উড়োজাহাজে চড়িবার বিপদ আছে, ভাড়া আছে, আর সময়ও লাগে যথেষ্ট। তবুও উহার ওপর জন্মিয়াছে বিশ্বাস।"**

মজার ব্যাপার হলো, আরজ আলী সাহেব আল্লাহর নবী-রাসূলদের সাথে পীর সাহেবদের গুলিয়ে একাকার করে ফেলেছেন। ইব্রাহীম 'আলাইহিস সালাম আল্লাহর নবী ছিলেন। উনাকে তিনি আগুনের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। ইউনুস 'আলাইহিস সালাম আল্লাহর নবী ছিলেন। উনাকে আল্লাহ তা'আলা মাছের পেট থেকে উদ্ধার করেছেন। সুলাইমান 'আলাইহিস সালাম ছিলেন আল্লাহর নবী। তিনি পশুপাখির ভাষা বুঝতেন এবং জ্বীনরা হাওয়ায় উড়ে তাঁর সিংহাসন বহন করত। মূসা 'আলাইহিস সালাম আল্লাহর নবী ছিলেন। উনি হাত থেকে লাঠি রাখলেই তা সাপ

হয়ে যেত এবং মূসা 'আলাইহিস সালাম আল্লাহর সাথে বিনা মাধ্যমে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলেন। ঈসা 'আলাইহিস সালাম পেয়েছিলেন মৃতকে জীবন দান করার ক্ষমতা এবং কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্যদানের ক্ষমতা।

আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন আল্লাহর সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তিনি মি'রাজের মাধ্যমে সরাসরি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ ও কথা বলার সুযোগ লাভ করেছেন। তারা এ সবকিছুর সুযোগ পেয়েছিলেন, কারণ—তারা আল্লাহর নবী, আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর দূত ছিলেন।

আরজ আলী সাহেব পীর সাহেবানদেরও এ রকম সুযোগের জন্য 'ট্রাই' করার উপদেশ দিচ্ছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই পীর সাহেব কি আল্লাহর প্রেরিত কোনো নবী? কোনো রাসূল? বা বিশেষ কোনো দূত? যদি না হয়, তাহলে তারা কীভাবে এ রকম সুযোগ লাভ করতে পারে? আর কোন সেন্স থেকেই বা আরজ আলী পীর সাহেবদের কাছে এ রকম প্রস্তাব রাখে যেখানে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরে দুনিয়ার বুকে শ্রেষ্ঠ মানব আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এবং ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু 'আনহুরা এই সুযোগ পাননি?

তিনি আরও লিখেছেন,

> **"অতীতে কোন কোন বোজর্গান হাঁটিয়াই নদী পার হইতে পারিতেন। যেহেতু তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, নদী পার করাইবেন আল্লাহ তা'আলা। নৌকা বা জলযানের দরকার নাই। আর বর্তমানে খোদার ওপর বিশ্বাস নাই, নদী পার হইতে সাহায্য লইতে হয় নৌকার।"**

পাঠক নিশ্চয়ই এতক্ষণে হাসা শুরু করেছেন। ভাবছেন, আরে! লোকটা কিসের সাথে কি মেলায়? আসলেই তা-ই। উনার জানা ইসলাম আর মূল ইসলাম এক নয়। উনি বিকৃত যে ইসলামকে চিনতেন বা জানতেন, সেটাকে পুঁজি করেই এগিয়েছেন। খুব ভালো করতেন যদি কোনো ভালো আলেমের সান্নিধ্যলাভের চেষ্টা করতেন। বুজুর্গানের হেঁটে নদী পার হওয়া উনার কাছে যদি সঠিক ইসলাম হয়, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গাধার পিঠে চড়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করাকে আমরা ঠিক কী বলতে পারি? উনি আরও লিখেছেন,

> **"সূফীগণ ধ্যানমগ্ন অবস্থায় পৃথিবীর কোথায় কী ঘটিতেছে তাহা জানিতে ও দেখিতে পাইতেন। এখন কয়টি লোকে উহা বিশ্বাস করে?"**

আবারও হাস্যকর কিছু কথাবার্তার ফুলঝুরি। এ কথা শরীয়তসম্মত যে, ভবিষ্যৎ বা গায়েবের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর হাতেই। এমনকি স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত গায়েব জানতেন না। ঠিক ততটুকুই জানতেন, যতটুকু আল্লাহ তাঁকে জানাতেন। কুরআনুল কারীমে বলা হচ্ছে,

> "আপনি বলুন, (হে রাসূল) আমি তোমাদের বলি না যে আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডার রয়েছে। তা ছাড়া, আমি গায়েবের ব্যাপারেও অবগত নই। আমি এমনও বলি না যে আমি ফেরেশতা। আমি তো শুধু সে ওহীর অনুসরণ করি যা আমার কাছে আসে।[১]"

আরও বলা হচ্ছে,

> "আপনি বলে দিন, (হে রাসূল) আমি আমার নিজের কল্যাণ সাধনের এবং অকল্যাণ সাধনের মালিক নই কেবল যা আল্লাহ চান (তা ছাড়া)। আর আমি যদি গায়েবের খবর জানতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম। ফলে আমার কোনো অমঙ্গল কখনোই হতে পারত না।[২]"

যেখানে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েবের খবর রাখতেন না, সেখানে কোন সে পীরানে পীর যে রাসূলের চেয়েও অ্যাডভান্সড?

এসব কথা আমরা ইসলামের নামে গ্রামের প্রচলিত কুসংস্কারগুলোতে দেখতে পাই। কিন্তু আরজ আলী সাহেবের মতো একজন দায়িত্ববান, সুশিক্ষিত লোক যদি এসব কুসংস্কারকে হাতিয়ার করে ধর্মকে আক্রমণ করে বসে, তখন ব্যথিত হওয়া ছাড়া আমাদের আর কীই-বা করার থাকে?

---

১ সূরা আল-আন'আম (০৬) : ৫০
২ সূরা আল-আ'রাফ (০৭) : ১৮৮

আত্মাবিষয়ক

আত্মা বিষয়ে আলোচনা করার আগে কিছু কথা বলে নেওয়া জরুরি মনে করছি। 'আত্মা' হচ্ছে এমন একটি জিনিস, যেটা সৃষ্টির সবচেয়ে কঠিন রহস্যগুলোর একটি। এ বিষয়ে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। বিজ্ঞান এবং দর্শনেও বহুলআলোচিত বিষয়গুলোর একটি হলো এই 'আত্মা'। এই বিষয়ের ওপর অনেক বই লেখা হয়েছে, অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে এবং হচ্ছে।

ধর্মীয় কিতাবাদিতেও আত্মার ব্যাপারে অসংখ্য কথা পাওয়া যায়। কুরআনুল কারীমের অনেক জায়গায় 'আত্মা' সম্পর্কে বলা হয়েছে। তবে কোথাও একথা বলা নেই যে এই 'আত্মা' আসলে কিসের তৈরি। তবে আরজ আলী মাতুব্বরের সত্যের সন্ধান বইতে 'আত্মা' অধ্যায়ে 'আত্মা' সম্পর্কে যে ধারণাগুলো তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলো খুবই হাস্যকর, শিশুসুলভ। আত্মা, প্রাণ সম্পর্কে কোনো রকম পড়াশুনা বা জানাশোনা না থাকলেই মানুষ কেবল এ-জাতীয় প্রশ্ন করতে পারে।

আরজ আলী সাহেব উনার প্রশ্নের মধ্যে 'আত্মা' এবং 'প্রাণ' শব্দদ্বয়কে সমার্থক ধরে নিয়ে এগিয়েছেন। প্রশ্ন করেছেন। কিন্তু কুরআনুল কারীমে যেটা 'আত্মা', সেটা আবার 'প্রাণ' নয়। আবার কুরআন অনুসারে যেটা 'প্রাণ', সেটা 'আত্মা' নয়। কুরআনুল কারীমের সঠিক জ্ঞান, কুরআনের সঠিক অর্থ না জানলেই এ রকম জগাখিচুড়ি বানিয়ে ফেলা সম্ভব। যাহোক, এই অধ্যায়ে আমরা দেখব আরজ আলী সাহেব 'আত্মা' বিষয়ে উনার প্রশ্ন নিয়ে কীভাবে এগিয়েছেন।

'আত্মা' বিষয়ে উনার প্রথম প্রশ্ন হলো,

> **'এই রক্ত-মাংস, অস্থি, মেদ-মজ্জায় গঠিত দেহটাই কী আমি? তা-ই যদি হয়, তবে মৃত্যুর পরে যখন দেহের উপাদানসমূহ পচিয়া-গলিয়া অর্থাৎ রাসায়নিক পরিবর্তনে কতগুলি মৌলিক ও যৌগিক পদার্থে রূপান্তরিত হইবে, তখন কি আমার আমিত্ব থাকিবে না? যদি না-ই থাকে, তবে স্বর্গ-নরকের সুখ-দুঃখ ভোগ করিবে কে?'**

মাতুব্বর সাহেব এই জায়গায় ভুল করেছেন। যেনতেন কোনো ভুল নয়। মারাত্মক ভুল। ধর্মগুলো যে 'পারলৌকিক' অর্থাৎ ইহজগতের পরে আরও একটা জগৎ সম্পর্কে ধারণা দেয়, সে ব্যাপারে উনার সম্ভবত জানা নেই। অথবা হতে পারে যা জানেন, তা পরিপূর্ণ না। অবশ্য মাতুব্বর সাহেবকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। এমন নয় যে এই প্রশ্ন ঘুম থেকে উঠে আমরা নতুন দেখছি। এই প্রশ্নটা বহু বহু পুরোনো। আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দ শ বছর আগে মক্কার কাফির-মুশরিকও ঠিক এই প্রশ্নগুলোই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে করত।

একবার একজন মুশরিক ব্যক্তি (উবাই ইবন খালাফ মতান্তরে ওয়ায়েল ইবন সাহম বা তাদের উভয়েই) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে দুটো পুরোনো হাড় নিয়ে এসে ঘষা দিলো। ঘষা দেওয়ার ফলে হাড়গুলো গুঁড়ো হয়ে নিচে পড়তে লাগল। এরপর ওই মুশরিক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, 'হে মুহাম্মদ, এ রকম গুঁড়ো হয়ে যাওয়ার পরেও কি এগুলো আবার জীবিত হবে?'

মুশরিক ব্যক্তির উদ্দেশ্য ছিল 'জানা' নয়, ব্যঙ্গ করা। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'আলা সূরা ইয়াসীনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো নাযিল করলেন:

"আর সে আমার উদ্দেশে উপমা পেশ করে অথচ সে তার নিজেকে সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। সে বলে, হাড়গুলো জরাজীর্ণ হওয়া অবস্থায় কে সেগুলোকে আবার একত্র করে জীবিত করবে?[১]"

---

১ তাফসীরে তাবারী, সূরা ইয়াসিন (৩৬): ৭৮

"বলুন (হে মুহাম্মদ), তিনিই জীবিত করবেন যিনি এগুলোকে প্রথম বার সৃষ্টি করেছিলেন। আর তিনি সকল সৃষ্টি সম্পর্কেই সর্বজ্ঞাত।[১]"

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আরজ আলী সাহেবরা যে প্রশ্নগুলো এখন বসে করছেন, তা নতুন কিছু নয়। এই প্রশ্নগুলো চৌদ্দ শ বছর আগে মক্কার মুশরিক, কাফিররা করেছিল।

এগুলোর উত্তর তখনই দেওয়া হয়েছে। আবার প্রতিযুগের আলেম, ফকীহ, ইমামগণ দিয়েছেন। কিন্তু বাতিল তথা মিথ্যার একটি রূপ এমন যে, সে বার বার ভিন্ন ভিন্ন রূপে, ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমে সত্যানুসন্ধানীদের বিভ্রান্ত করতে চায়।

আমরা এবার আরজ আলী সাহেবের প্রশ্নে ফিরে যাই আবারো। তিনি বলতে চেয়েছেন—মৃত্যুর পর যেহেতু আমাদের শরীর পচে-গলে মাটির সাথে মিশে যাবে, তাহলে পরকালের সুখ-দুঃখ, শাস্তি-পুরস্কার ভোগ কে করবে?

পাঠক, একটি ঘটনা কল্পনা করার চেষ্টা করুন। ধরুন, আপনার হাতে এই মুহূর্তে যে মোবাইল ফোনটি আছে, সেটি হলো iPhone 8। ধরুন, এই মোবাইল ফোনটি হাতে নিয়ে আপনি রিকশা করে বাসায় ফিরছেন। রিকশায় বসে বসে আপনি মনের আনন্দে ফেইসবুক চালাচ্ছেন। বিভিন্ন বন্ধুবান্ধবের পোস্টে, ফটোতে লাইক দিচ্ছেন, কমেন্ট দিচ্ছেন, রিপ্লে দিচ্ছেন। হঠাৎ পেছন থেকে আরেকটি রিকশা এসে জোরে আপনাদের রিকশাকে ধাক্কা দিলো। এর ফলে কী হলো? আপনি পড়তে পড়তেই বেঁচে গেলেন, কিন্তু আপনার হাতে থাকা স্যামস্যাং ব্র্যান্ডের ফোনটা হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙে কয়েক টুকরো হয়ে গেল। আপনি মন খারাপ করে বাসায় ফিরে আসলেন। বাসায় ফিরে আপনি আপনার ল্যাপটপ ওপেন করে ফেইসবুকে লগইন করলেন।

আচ্ছা বলুন তো, আপনার হাত থেকে মোবাইল ফোনটি পড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে কী আপনার ফেইসবুক অ্যাকাউন্টটিও নষ্ট হয়ে গেছে? আপনার ফেইসবুক প্রোফাইল গায়েব হয়ে গেছে? আপনার সবরকম ফেইসবুক অ্যাক্টিভিটি হাওয়া হয়ে গেছে? নাহ। এর কোনোটাই হয়নি। আপনি যখনই নতুন মাধ্যমে, নতুন ডিভাইসে আপনার মেইল এবং পাসওয়ার্ড দিয়েছেন, আপনার পূর্বের সকল

---

১ তাফসীরে তাবারী, সূরা ইয়াসিন (৩৬) : ৭৯

অ্যাক্টিভিটি আবার চলে এসেছে।

এখানে ব্যাপারটাও কিছুটা সে রকম। আমাদের এই দেহটা হচ্ছে স্যামস্যাং ব্র্যান্ডের মোবাইল ফোনটার মতোই। এটা নষ্ট হয়ে যাওয়া মানেই কিন্তু আমার সকল ভার্চুয়াল অ্যাক্টিভিটি হারিয়ে যাওয়া নয়। আর আমাদের আত্মাটা হচ্ছে ফেইসবুক অ্যাকাউন্টের মতো। যে মাধ্যমেই এটার মেইল, পাসওয়ার্ড দেওয়া হবে, আমার সকল ভার্চুয়াল অ্যাক্টিভিটি হুবহু ফেরত আসবে।

আরজ আলী সাহেবদের বলতে চাই, এ জীবনপরবর্তী জীবনে আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা যখন বলবেন, 'হও', তখন আমাদের পচে-গলে মাটির সাথে মিশে যাওয়া হাড়গুলো পুনরায় একত্র হয়ে যাবে। আর তাতে যখন আমাদের রূহটাকে প্রবেশ করানো হবে, তখন আমরা আবার প্রাণ ফিরে পাব। তখনই আমাদের ওপরে শেষকালের শাস্তি-পুরস্কার নির্ধারিত হবে এবং আমরা তা ভোগ করব।

আরজ আলী সাহেবের দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো 'প্রাণের রূপ'' নিয়ে। তিনি প্রশ্ন করেছেন,

> **'প্রাণ যদি অরূপ বা নিরাকার হয়, তবে দেহাবসানের পরে বিশ্বজীবের প্রাণসমূহ একত্র হইয়া একটি অখণ্ড সত্তা বা শক্তিতে পরিণত হইবে না কি? অবয়ব আছে বলিয়াই পদার্থের সংখ্যা আছে। নিরাবয়ব বা নিরাকারের সংখ্যা আছে কি? আর সংখ্যা না থাকিলে তাহার স্বাতন্ত্র্য থাকে কি? পক্ষান্তরে প্রাণ যদি স্বরূপ বা সাকার হয়, তবে তাহার রূপ কী?'**

এই প্রশ্নটি থেকেই বোঝা যায় যে, আরজ আলী সাহেব আসলে বিজ্ঞান সম্পর্কে তেমন কিছুই জানতেন না। অবশ্য তিনি যে সময়ে বসে কথাগুলো বলেছেন, সেই সময়ে বিজ্ঞান আজকের সময়ের মতো এত বেশি অ্যাডভান্সড ছিল না। এ জন্যই বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে কখনোই 'চূড়ান্ত' সিদ্ধান্তে যেতে নেই।

যাহোক, আমরা আরজ আলী সাহেবের এই প্রশ্নটার শেষদিক থেকে আগাব। তিনি এই প্রশ্নের একদম শেষে লিখেছেন,

'প্রাণ যদি স্বরূপ বা সাকার হয়, তবে তাহার রূপ কী?'

আরজ আলী সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলতে চাই, প্রাণ দৃশ্যমান নয় তবে তারও

একটি অস্তিত্ব আছে; যা মানুষের শরীরে প্রবেশ করে ও বের হয়। [যাকে বলা হয় জিসমে লাতীফ বা সূক্ষ্ম শরীর]

এখন উনার প্রশ্ন—

> **'নিরাবয়ব বা নিরাকারের সংখ্যা আছে কি?'**

জি। নিরাকার জিনিসেরও সংখ্যা আছে। পরিমাণ আছে। বিজ্ঞান নিয়ে হালকা-পাতলা জানে এমন লোকও এখন জানে যে, পৃথিবীতে দুই ধরনের পদার্থ আছে। দৃশ্য এবং অদৃশ্য। দৃশ্যমান পদার্থগুলো আমরা আমাদের চোখ দিয়ে দেখি। যেমন আকাশ, সাগর, পাহাড়, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি। আবার আরেক ধরনের পদার্থ আছে যেগুলো আমরা দেখি না। এমনকি শক্তিশালী আণুবীক্ষণিক যন্ত্র দিয়েও এই পদার্থগুলো দেখা যাবে না। এগুলো যে দেখা যাবে না, এটা স্বয়ং বিজ্ঞানও স্বীকার করে। বিজ্ঞানীরা এই অদৃশ্য পদার্থের নাম দিয়েছে ডার্ক ম্যাটার বা 'অদৃশ্য বস্তু'। **নাসার রিপোর্টমতে, আমাদের মহাবিশ্বের দৃশ্যমান পদার্থের পরিমাণ হলো মাত্র ৫%। বাকি ৯৫% পদার্থ আমরা দেখি না বা দেখতে পাব না। এটাকেই বলা হচ্ছে ডার্ক ম্যাটার।**[১]

এখন দেখা যায় না বা নিরাকার বলে কি এগুলোর কোনো অস্তিত্ব নেই? নিরাকার বলে কি এগুলোর কোনো পরিমাপ, পরিমাণ করা যায় না? যায়। ডার্ক ম্যাটারের অবশ্যই অস্তিত্ব আছে এবং এটা এখন বিজ্ঞানমহলে আলোচিত হটকেকগুলোর একটি। ডার্ক ম্যাটার অদৃশ্য বস্তু। কিন্তু বিজ্ঞান এটাকে পরিমাপ করতে পেরেছে। বিজ্ঞান জানিয়েছে মহাবিশ্বে ডার্ক ম্যাটারের পরিমাণ ৯৫%। সুতরাং অদৃশ্য হলেই যে অস্তিত্বহীন হয়ে যায়, অদৃশ্য হলেই যে পরিমাপ বা সংখ্যাহীন হয়ে পড়ে, এই ধারণা এখন বাতিল। আরজ আলী সাহেবদের সেই পুরোনো ধ্যান-ধারণায় বিজ্ঞান এখন আর বসে নেই।

আরজ আলী সাহেবের তৃতীয় প্রশ্নটি ছিল—

> **"সাধারণত আমরা জানি যে, মন ও প্রাণ এক নহে। কেননা উহাদের চরিত্রগত পার্থক্য বিদ্যমান। আমরা আমাদের নিজেদের উপলব্ধি হইতে জানিতে পাইতেছি**

---

১ https://science.nasa.gov/astrophysics/focus-areas/what-is-dark-energy

> **যে, "মন" প্রাণের ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু "প্রাণ" মনের ওপর নির্ভরশীল নয়। মন নিষ্ক্রিয় থাকিলেও প্রাণের অভাব পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু প্রাণ নিষ্ক্রিয় হইলে মনের অস্তিত্বই থাকে না।"**

এতটুকুতে আরজ আলী সাহেব দুটো বক্তব্য রেখেছেন। প্রথমটি হলো, 'মন ও প্রাণ এক নয়।' এই কথাটির সাথে এক শ ভাগ একমত। মন ও প্রাণ কখনোই এক নয়। দুটো আলাদা জিনিস। তা ছাড়া আরজ আলী সাহেবের উপর্যুক্ত বক্তব্য দিয়ে তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে তেমন সুবিধা করতে পারবেন না। কারণ, ইসলাম মন ও প্রাণ আলাদা বলে থাকে। একটির নাম কলব, আরেকটির নাম নাফস।

কিন্তু এরপরেই আরজ আলী সাহেব আবার একটি ভুল করে বসেছেন। তিনি বলেছেন,

'মন নিষ্ক্রিয় থাকলেও প্রাণের অভাব পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু প্রাণ নিষ্ক্রিয় থাকলে মনের অস্তিত্বই থাকে না।'

প্রাণ নিষ্ক্রিয় থাকলে মনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবার কথা আদৌ ঠিক নয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকেই এটা একদম অবৈজ্ঞানিক কথা। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, মানুষের 'প্রাণ' অবর্তমান থাকা অবস্থাতেও 'মন' বর্তমান থাকে। Near Death Experiences Research Foundation নামে বিজ্ঞানী Jeffrey Long এর একটি রিসার্চ ফাউন্ডেশন আছে। এই ফাউন্ডেশনটি বিগত ২৫ বছর ধরে 'মৃত্যুপরবর্তী জীবন' নিয়ে গবেষণা করছে।

কোনো মানুষ যখন গুরুতর অ্যাকসিডেন্ট করে বা হার্ট অ্যাটাক করে, তখন ডাক্তাররা ওই ব্যক্তিকে 'ক্লিনিক্যালি ডেথ' বলে ঘোষণা দিয়ে দেন। অর্থাৎ ডাক্তারদের ভাষায় এই লোক মৃত। কিন্তু 'ক্লিনিক্যালি ডেথ' ঘোষিত হবার পরেও এ রকম কিছু কিছু ব্যক্তি আল্লাহর ইচ্ছায় আবার প্রাণ ফিরে পায়। বিজ্ঞানী Jeffrey Long এর এই সংগঠনটি মূলত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের এ রকম 'ক্লিনিক্যালি ডেথ' থেকে ফিরে আসা ব্যক্তিদের নিয়ে গবেষণা করে। তারা ওইসব ব্যক্তিদের কাছে জানতে চায়, 'ক্লিনিক্যালি ডেথ' হয়ে যাবার পরে তারা কোথায় ছিল, কী করছিল, আর কি দেখেছিল?

এ রকম অবস্থা থেকে ফিরে আসা সকলের বক্তব্য প্রায় একই রকম দেখা যায়। তারা বলে, 'ক্লিনিক্যালি ডেথ হবার পরেও, অর্থাৎ ডাক্তারদের ভাষায় 'প্রাণ ত্যাগ' করার পরেও তারা চারপাশের সবকিছু দেখতে পায়। কে কী বলে তা শুনতে পায়। এ সময় তারা যেখানে ইচ্ছে চলে যেতে পারে। অর্থাৎ ওই সময়টাতে তারা আর নিজের শরীরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এ সময় তারা বিশেষ করে তাদের জীবনের একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে পায়।

এ বিষয়ে Dr. Jeffrey Long এর একটি বিখ্যাত বইও আছে। বইটির নাম Evidence Of the Afterlife। তাদের প্রতিষ্ঠিত সংগঠনটি হলো http://www.nderf.org।

অর্থাৎ এই সমস্ত বিজ্ঞানীদের যাবতীয় কাজ, গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এটাই প্রমাণ করে যে, মন অবশ্যই প্রাণের ওপরে নির্ভরশীল নয়। মানুষের প্রাণ না থাকা অবস্থাতেও তার মন বর্তমান থাকতে পারে। সুতরাং 'প্রাণ নিষ্ক্রিয় হলেই মনের অস্তিত্ব থাকে না' মর্মে আরজ আলী সাহেবের দেওয়া বক্তব্য অসত্য এবং অবৈজ্ঞানিক।

অধ্যায়ের চতুর্থ প্রশ্নে এসে আরজ আলী সাহেব লিখেছেন,

> **'দেহ জড় পদার্থ। কোনো জীবের দেহ বিশ্লেষণ করিলে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, লৌহ, ফসফরাস, ইত্যাদি নানা প্রকার মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন অনুপাতে অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখা যায়। পদার্থসমূহ নিষ্প্রাণ। কাজেই পদার্থসমূহের যথানুপাতে সংমিশ্রিত অবস্থাকেই প্রাণ বলা যায় না। পদার্থসমূহের যথানুপাতে সংমিশ্রণ এবং আরও কিছুর ফলে দেহে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা যায়। ঐ 'আরও কিছু' কে আমরা মন বলিয়া থাকি। কিন্তু মানুষের দেহ, মন ও প্রাণে কিছু সম্পর্ক বা বন্ধন আছে কি? থাকিলে তাহা কিরূপ? আর না থাকিলেই বা উহারা একত্র থাকে কেন?'**

আরজ আলী মাতুব্বর সাহেবের কথাগুলোকে একটু খুঁটিয়ে দেখলেই উনার প্রতিটা প্রশ্ন থেকেই খুঁত বের করা যাবে। এসব নিয়ে লিখতে বসলে পাতার পর পাতা হয়তো শেষ হবে, কিন্তু উত্তর লেখা আর শেষ হবে না। তিনি আবারো প্রাণ ও মনকে গুলিয়ে ফেলেছেন।

এই যেমন : চতুর্থ নম্বর প্রশ্নের প্রথম লাইনেই একটি ভুল তথ্য। উনি বলেছেন, 'দেহ জড় পদার্থ।'

অথচ হালকা বিজ্ঞান বোঝে এমন লোকমাত্রই জানে যে, মানবশরীর গঠিত হয় অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের মাধ্যমে। প্রতিটি কোষের রয়েছে স্বতন্ত্র জীবনপ্রক্রিয়া। প্রতিটি কোষেরই প্রাণ আছে। তাহলে প্রাণসম্পন্ন এই কোষ দিয়ে গঠিত দেহটাকে জড়পদার্থ বলাটা কতটুকু যৌক্তিক বা বিজ্ঞানসম্মত?

তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক যে, মানুষের কোষগুলোকে বিশ্লেষণ করলে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, লৌহ, ফসফরাস ইত্যাদি পাওয়া যায়। কিন্তু বিজ্ঞানমনস্ক যেকোনো ব্যক্তিমাত্রই জানে যে, পদার্থের পরমাণুগুলো কখনোই স্থির থাকে না এবং পরমাণু কখনোই জড়বস্তুর মতন আচরণও করে না। আমরা জানি, প্রতিটি পরমাণুর তিনটি মৌলিক কণিকা থাকে। সেগুলো হলো ইলেক্ট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন। এই তিনটি কণিকা আবার বিভিন্ন অনুপাতে একত্র হয়ে আবার ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু গঠন করে। প্রোটন এবং নিউট্রন মিলে তৈরি হয় নিউক্লিয়াস এবং এদেরকে ঘিরে ইলেকট্রন সার্বক্ষণিক ঘুরতে থাকে। সুতরাং মানুষের শরীরের কোষগুলো ভেঙে যখন পরমাণুতে পরিণত হয়, তখনো কি তাকে জড়বস্তু দাবি করা যায়? তাহলে চিন্তা করুন, পুরো দেহটাকেই জড়পদার্থ বলে দেওয়াটা কতটা অবৈজ্ঞানিক।

পঞ্চম প্রশ্নে আরজ আলী সাহেব লিখেছেন,

> **"প্রাণ চেনা যায় কি? কোনো মানুষকে 'মানুষ' বলিয়া অথবা কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে আমরা তাহার রূপ বা চেহারা দেখিয়াই চিনিতে পাই। প্রাণ দেখিয়া নয়। পিতা-মাতা-ভাই-বোন-আত্মীয়-স্বজন সকলকে রূপ দেখিয়াই চিনি, সম্বোধন করি। তাহাদের সাথে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম নিষ্পন্ন করি। প্রাণ দেখিয়া কাহাকেও চিনিবার উপায় নাই...'**

আগেই উল্লেখ করেছি, আরজ আলী সাহেব জীবন ও আত্মা শব্দগুলোর মধ্যে গুলিয়ে ফেলেছেন। শব্দগুলোর অর্থ কাছাকাছি, কিন্তু এক নয়। প্রাণ বলতে মানুষের জীবনকে বোঝানো হলে কোরআনিক পরিভাষাতেও যা জীবন, তা আত্মা নয়। আবার যা আত্মা, তা জীবন নয়। কুরআনে কারীম 'জীবন' শব্দটার জন্য ব্যবহার

করেছে 'হায়াত বা হাই' অন্যদিকে 'আত্মা'র জন্য ব্যবহার করেছে 'রূহ'।

দুটো শব্দকে গুলিয়ে ফেলাটা নিতান্তই বোকামি এবং অজ্ঞতা। আরজ আলী সাহেব যদি ওপরের প্রশ্নে 'প্রাণ' বলতে প্রাণিকোষে যে প্রাণ, নিউক্লিয়াসে যে 'প্রাণ', সে প্রাণটাকে উদ্দেশ্য করে থাকেন, তাহলে ঠিক আছে। যদি তিনি 'প্রাণ' বলতে সেই প্রাণটাকে বুঝিয়ে থাকেন তো আমাদেরও কোনো আপত্তি নেই। আমরাও স্বীকার করি যে সেই প্রাণ দেখে আসলেই চেনার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু আরজ আলী সাহেব যদি উনার প্রশ্নে 'প্রাণ' বলতে 'রূহ' বা 'আত্মা' কে বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের আবারও এই কথাটা বলতে হচ্ছে যে, আত্মা সম্পর্কে আরজ আলী সাহেবের ন্যূনতম ধারণাই নেই। আত্মা বলতে কিছু প্রোটিন অণু একসাথে হয়ে কোষগঠন এবং সেখান থেকে জীবনের উৎপত্তিকে বোঝায় না। আত্মা হচ্ছে একটি আলাদা সূক্ষ্ম সত্তা, যা মানুষের চোখে দেখা না গেলেও সেটা মানুষে শরীরে অবস্থান নেয় এবং যখন সময় হয় তখন সেটা বের হয়ে যায়; সেটার থাকার জায়গা নির্দিষ্ট করা আছে। সেটার সাথে শরীরের আবার সম্পর্ক তৈরি হয়। সেটার অস্তিত্ব বোঝা যায় ও অনুভব করা যায়।

এই অধ্যায়ে আরজ আলী সাহেবের আরও দুটি প্রশ্ন আছে। এ দুটি প্রশ্নের উত্তর পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বিস্তারিত আলাপ করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

ঈশ্বর সংক্রান্ত

"ঈশ্বর সংক্রান্ত" শিরোনামের অধ্যায়ে আরজ আলী মাতুব্বর সাহেব বেশ কিছু আপত্তি তুলে এনেছেন ঈশ্বর তথা স্রষ্টাসংক্রান্ত। এই অধ্যায়ে আমি চেষ্টা করব বিষয়টি ক্লিয়ার করতে।

আরজ আলী সাহেব হিন্দুধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম এবং ইসলামধর্মে স্রষ্টার ধারণা দিতে গিয়ে ইসলামের ব্যাপারে আপত্তি তুলে বলেছেন,

> **"মুসলিম ধর্মযাজকদের নিকট শোনা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা আরশে কুরছীর ওপরে বসিয়া রেজওয়ান নামক ফেরেশতার সাহায্যে বেহেস্ত, মালেক নামক ফেরেশতার সাহায্যে দোযখ, জেব্রাইলের সাহায্যে সংবাদ এবং মেকাইলকে দিয়া খাদ্য বণ্টন ও আবহাওয়া পরিচালনা করেন। সর্বশক্তিমান বিশ্বজগতের কার্যপরিচালনার জন্য ফেরেশতার সাহায্যের আবশ্যক কী?"**

প্রথমেই বলি, কোনো বিষয়ে কথা বলতে হলে সে বিষয়টির জ্ঞান অথেনটিক সোর্স থেকে নিতে হয়। ইসলাম সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান এতই শোনা কথার ওপর নির্ভরশীল যে তার কথার জবাব দেওয়া অনেকটাই সময়ক্ষেপণ ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। তিনি বলেছেন, 'মুসলিম ধর্মযাজকদের থেকে শোনা যায়' এ কথাটি আপত্তিজনক।

তিনি নিজে সোর্স পড়ে না দেখে মন্তব্য করার মাধ্যমে নিজেকে মূর্খদের কাতারে ফেলবেন এটা আমরা ধারণাও করতে পারি না। তারপর তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা আরশে কুরসির ওপর বসিয়া' তার একথাটিও একটি মিথ্যা ও জঘন্যতম জগাখিচুড়ি টাইপের কথা। আল্লাহ আরশে কুরসির ওপর বসেছেন এটা মুসলিমরা বলে না, তা ছাড়া আরশ ও কুরসি ভিন্ন দুটি জিনিস, আরশের সামনে কুরসি অতীব ক্ষুদ্র জিনিস। সে কুরসীতে আসমান-যমীন কয়েকটি মুদ্রার মতো।

দ্বিতীয়ত, ফেরেশতাদের নিযুক্ত করা নিয়ে আরজ আলী সাহেব অত্যন্ত শিশুসুলভ একটি দাবির উত্থাপন করেছেন এখানে। তাঁর কথার সারমর্ম হচ্ছে, আল্লাহ যেহেতু সর্বশক্তিমান, তাই তিনি কেন ফেরেশতাদের সাহায্য নেবেন বিশ্বপরিচালনায়?

এখানে যে ভুলটি তিনি করেছেন তা হলো, ফেরেশতাদের তিনি আল্লাহর সাহায্যকারী ভেবে বসে আছেন। তিনি ধরেই নিয়েছেন যে আল্লাহ ফেরেশতাদের মুখাপেক্ষী। কিন্তু কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে,

"তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন।[১]"

আরজ আলী সাহেব এখানে 'অধীনস্থ' আর 'সাহায্যকারী'-এর মধ্যে গুলিয়ে ফেলেছেন। ফেরেশতাদের দিয়ে তিনি এই কাজগুলো করাচ্ছেন মানে এটা নয় যে তিনি ফেরেশতাদের সাহায্য নিচ্ছেন; বরং এটাই ফেরেশতাদের জন্য ইবাদাত। তারা আল্লাহর এসব কমান্ড ফলো করবে—এটাই তাদের ইবাদাত। তাদের এই কাজের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।

আমি চাইলেই আমার বাসার সকল কাজকর্ম নিজেই করতে পারি। কিন্তু আমার ইচ্ছে হলো যে, এসব আমি করব না। অন্যকে দিয়ে করাব। এরপর আমি যদি এমন অত্যাধুনিক একদল রোবট তৈরি করি যাদের কেউ আমার কাপড় ধুয়ে দেবে, কেউ কাপড় ইস্তিরি করে দেবে, কেউ আমার রান্নাবান্না করে দেবে, কেউ আমার রিডিং রুম আর বেড রুম গুছিয়ে দেবে, কেউ আমার ব্যবসায়ের হিসাবপত্র

---

১ সূরা আল ইখলাস (১১২) : ০২

মিলিয়ে দেবে, কেউ বাগান পরিচর্যা করবে ইত্যাদি। আমি যদি আমার বাসার এ সকল কাজ আমারই তৈরি অত্যাধুনিক রোবটকে দিয়ে করাই, তাহলে এর দ্বারা কি এটাই প্রমাণ হয় যে আমি আসলে আমার বাসার কাজকর্ম করতে অক্ষম? নাহ, এটা প্রমাণ হয় না; বরং এতে আমার সম্মান, ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। আমারই তৈরি একদল সুপার রোবট দল যখন কেবল আমার নির্দেশনামতো সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করে যায়, তখন আমার বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান, আর অসাধারণ সৃষ্টিশৈলী প্রকাশ পায়। আমি কিন্তু কোনোভাবেই আমার তৈরি রোবটের অধীন বা মুখাপেক্ষী নই; বরং তারাই আমার মুখাপেক্ষী।

তারা আমার তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করে যেতে বাধ্য। আমি ইচ্ছে করলেই তাদের প্রোগ্রাম চেইঞ্জ করে দিতে পারি। আমি সেই ক্ষমতা রাখি। সুতরাং ফেরেশতাদের দিয়ে বিশ্ব পরিচালনা করাটা আল্লাহর সীমাবদ্ধতা নয়; বরং এটা তাঁর ক্ষমতারই একটা অংশ। আরজ আলী এই জায়গায় এসে ভুল ব্যাখ্যা করেছেন।

আরজ আলী সাহেব বলেছেন,

> **"আল্লাহ তা'লা দেখেন, শোনেন, বলেন ইত্যাদি শুনিয়া সাধারণ মানুষের মনে স্বতই প্রশ্ন জাগে—তবে কি আল্লাহর চোখ, কান ও মুখ আছে? কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, আছে। তবে তাহা মানুষের মতো নয়, কুদরতি। কিন্তু 'কুদরতি' বলিতে কীরূপ বুঝায়, তাহা তাহারা ব্যাখ্যা করেন না। আবার যখন শোনা যায় যে, খোদা তা'লা অন্যায় দেখিলে ক্রুদ্ধ হন, পাপীদের ঘৃণা করেন, কোন কোন কাজে খুশী হন ও কোন কোন কাজে বেজার হন, তখন মানুষ ভাবে—খোদার কি মানুষেরই মতো মন আছে? আর খোদার মনোবৃত্তিগুলি কি মানুষেরই অনুরূপ?"**

আরজ আলী সাহেবের যুক্তি হচ্ছে, রাগ করা, ক্রুদ্ধ হওয়া, খুশি-বেজার হওয়া মানবীয় গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহও যেহেতু কারও অন্যায় দেখলে রাগ করেন, ক্ষুব্ধ হন, বেজার হন, ভালো কাজ দেখলে খুশি হন, তাহলে আল্লাহও কি মনুষ্যভাবাপন্ন কি না? অর্থাৎ আল্লাহর মধ্যে মানুষের মতো গুণাবলি আছে কি না?

প্রথমত, আল্লাহ দেখেন, শোনেন। এগুলো আল্লাহর সিফাত বা গুণ। মানুষও দেখে, শুনে। এর মানে কোনোভাবেই এটা বোঝায় না যে, আল্লাহর মধ্যে মানবীয় গুণাবলি আছে।

আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞাত। অর্থাৎ তিনি সবকিছুই জানেন। এখন তিনি যদি মানুষকে 'জানা' মানে কী এই জ্ঞানটা না দিতেন, অর্থাৎ মানুষ যদি না-ই বুঝত যে 'জানা' বলতে আসলে কী বোঝায়, তাহলে তারা কীভাবে অনুধাবন করতে পারত যে আল্লাহ সর্বজ্ঞাত?

আল্লাহ সর্বশ্রোতা, অর্থাৎ তিনি সবকিছুই শোনেন। এমতাবস্থায় মানুষকে যদি তিনি 'শোনার' ক্ষমতা না দিতেন, তাহলে মানুষ কীভাবে উপলব্ধি করত যে তিনি সর্বশ্রোতা? আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা, অর্থাৎ তিনি সবকিছুই দেখেন। এখন তিনি যদি মানুষকে 'দেখা'-এর ক্ষমতাই না দিতেন, তাহলে মানুষ কীভাবে বুঝতে পারত যে আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা?

আল্লাহ এই দেখার, জানার, শোনার গুণাবলি দিয়েই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন যাতে করে মানুষ আল্লাহর ক্ষমতা বুঝতে পারে। কিন্তু এটা কোনোভাবেই বোঝায় না যে আল্লাহ মনুষ্যভাবাপন্ন। আল্লাহর দেখা, জানা, শোনার সাথে মানুষের দেখা, জানা আর শোনার কোনো তুলনা হতে পারে না; বরং প্রতিটি সত্তা অনুসারেই তার গুণাগুণ নির্ধারিত হয়ে থাকে। প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যেই গুণাগুণ আলাদা হয়ে থাকে। একটা মাছি শোনে আবার গরুও শোনে, তাই বলে এতদুভয়ের শোনা এক রকম নয়। একটি ডিভাইসও শোনে ও দেখে একটি মশাও শোনে ও দেখে কিন্তু তাদের মধ্যে কত পার্থক্য! সুবহানাল্লাহ, তাহলে স্রষ্টার গুণাগুণ সৃষ্টির মতো কেন হতে হবে?

আসলে আরজ আলী গংরা যদি স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন তখন গুণের প্রশ্নটির সমাধান পরে করা যাবে, আগে যেখানে তারা অস্তিত্বই মানছেন না সেখানে অন্য কথা বলা তাদের বাতুলতা বৈ নয়। যদি অস্তিত্ব মেনে নেন তবে মানতে হবে যে অস্তিত্বশীল সত্তার কোনো না-কোনো গুণ থাকবেই, সে গুণের প্রকৃত স্বরূপ আমাদের জানা থাকার প্রয়োজন নেই। তবে এতটুকু অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে, স্রষ্টার গুণাগুণ আলাদা যেমনি তার অস্তিত্ব আলাদা, সৃষ্টির কারও মতো করে তাঁর সত্তাকে কিংবা গুণকে ধারণা করা সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতা; কারণ, তা না জেনে মন্তব্য করা।

আর এ জন্যই কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন,

"তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই।[১]"

আল্লাহ মানুষকে ক্ষমতা দিয়েছেন বলেই মানুষ দেখতে পারে, শুনতে পারে, বুঝতে পারে। এটাকে আল্লাহর ক্ষমতার সাথে গুলিয়ে আল্লাহকে মনুষ্যভাবাপন্ন জ্ঞান করাটা নেহায়েত মূর্খতা। তিনি বলেছেন,

> **"ঈশ্বর যদি উনার সৃষ্ট পদার্থ হইতে ভিন্ন হন, তাহা হইলে তাহার সর্বব্যাপিত্ব থাকিতে পারে না। এবং ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিলে কোন সৃষ্ট পদার্থ এমনকি পদার্থের অণু-পরমাণুও ঈশ্বরশূন্য হইতে পারে না।"**

উনার পয়েন্ট হলো, আল্লাহ যদি সর্বব্যাপী, সবখানেই বিরাজ করেন, তাহলে তিনি কি নাপাক বস্তুর মধ্যেও বিরাজ করেন? যদি তা-ই হয়, তাহলে তিনি আর পরম, মহা পবিত্র সত্তা কীভাবে হন?

এখানে আরজ আলী সাহেব যে জিনিসটা বুঝতে ভুল করেছেন তা হলো আল্লাহ তা'আলার সর্বব্যাপিত্ব। উনি আল্লাহর সর্বব্যাপিত্ব বলতে ধরেই নিয়েছেন যে আল্লাহ জগতের সকল বস্তুর মধ্যেই বিরাজ করছেন। পাক-নাপাক সকল বস্তুর মধ্যেই। মূলত আল্লাহ তা'আলা তাঁর আরশের ওপরে রয়েছেন। তিনি সকল বস্তুর মধ্যে বিরাজমান নন; বরং তাঁর জ্ঞান ও দৃষ্টিই সকল বস্তুকে ঘিরে আছে। এটাই হলো আল্লাহর সর্বব্যাপিতা।

প্রসিদ্ধ চার ইমামের মতও এটাই যে, আল্লাহ তাঁর আরশের ওপরে রয়েছেন কিন্তু তাঁর জ্ঞান দ্বারা তিনি সৃষ্টিজগতের সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।

যেমন ইমাম আবু হানিফা বলেছেন,

'যে বলবে, আল্লাহ আসমানে আছেন না যমীনে তা আমি জানি না, সে কাফের হয়ে যাবে; কেননা, আল্লাহ বলেন, রহমান আরশের ওপরে আর তাঁর আরশ সপ্ত আকাশের ওপরে।[২]'

---

১ সূরা আশ-শূরা (৪২) : ১১

২ ইজতিমা'উল জুয়ুসিল ইসলামিয়্যাহ, পৃষ্ঠা : ৯৯

ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

'আল্লাহ আকাশের ওপর এবং তাঁর জ্ঞানের পরিধি সর্বব্যাপী বিস্তৃত। কোনো স্থানই তাঁর জ্ঞানের আওতার বহির্ভূত নয়।[১]'

ইমাম শাফি'ঈ (রহ.) বলেন,

'সুন্নাহ সম্পর্কে আমার ও আমি যে সকল হাদীসের বিদ্বানদের দেখেছি এবং তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছি যেমন : সুফিয়ান, মালেক ও অন্যান্যরা, তাদের মত হলো এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবূদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। আর আল্লাহ আকাশের ওপরে তাঁর আরশের ওপর রয়েছেন। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তাঁর সৃষ্টির নিকটবর্তী হন এবং যেভাবে ইচ্ছা নিকটবর্তী আকাশে অবতরণ করেন।[২]'

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ এর পুত্র আবদুল্লাহ বলেন,

'আমার বাবাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা, সপ্তম আকাশের ওপরে তাঁর আরশের ওপর রয়েছেন। তাঁর ক্ষমতা ও জ্ঞানের পরিধি সর্বত্র বিস্তৃত। এর উত্তরে তিনি (ইমাম আহমাদ) বলেন, হ্যাঁ, তিনি আরশের ওপরেই আছেন কিন্তু তাঁর জ্ঞানের বহির্ভূত কোনো কিছুই নেই।[৩]'

ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ আরও বলেন,

'যে বলবে যে আল্লাহ আসমানে আছেন না যমীনে আছেন তা আমি জানি না সে কাফির হয়ে যাবে, অনুরূপভাবে যে বলবে যে তিনি আরশে আছেন কিন্তু আরশ আকাশে না যমীনে অবস্থিত তা আমি জানি না, সেও কাফির হয়ে যাবে। কেননা, ওপরে থাকার জন্যই আল্লাহকে ডাকা হয়। নিচে থাকার জন্য নয়। আর নিচে থাকাটা আল্লাহর রুবূবিয়্যাত এবং উলূহিয়্যাতের গুণের কিছুই নয়।[৪]'

---

১ ইজতিমা'উল জুয়ুসিল ইসলামিয়্যাহ, পৃষ্ঠা : ১০১
২ ইজতিমাউল জুয়ুসিল ইসলামিয়্যাহ, ১২২
৩ ইজতিমাউল জুয়ুসিল ইসলামিয়্যাহ, ১৫২-১৫৩
৪ আল ফিকহুল আবসাত, পৃষ্ঠা : ৫১

বস্তুত আল-কুরআনের আয়াত থেকেই ইমামগণ এ আক্বীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করেছেন, যেমন আল্লাহ বলেন,

'দয়াময় আল্লাহ আরশের ওপর উঠেছেন।[১]'

'তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের ওপর উঠেছেন।[২]'

'তোমরা কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছ যে যিনি আরশের ওপরে আছেন তিনি ভূমিসহ তোমাদের ধসিয়ে দেবেন না?[৩]'

অনুরূপভাবে হাদীসে আছে,

“

মু'আওয়িয়া ইবন আল হাকাম আস-সুলামী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমার একজন দাসী ছিল। উহুদ ও জাওয়ানিয়্যাহ নামক স্থানে সে আমার ছাগল চরাত। একদিন দেখি, নেকড়ে আমার একটি ছাগলকে ধরে নিয়ে গেছে। আমি এক আদমসন্তান। তারা যেভাবে ক্ষুব্ধ হয়, আমিও সেভাবে ক্ষুব্ধ হই। ফলে আমি তাকে থাপ্পড় মেরে বসি। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসলে আমি একে এক সাংঘাতিক (অন্যায়) কাজ বলে গণ্য করি। তাই আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি কি তাকে মুক্ত করে দেবো? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে আমার নিকট নিয়ে আসো। আমি তাকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে নিয়ে আসলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহ কোথায়?' সে বলল, আসমানে। তিনি

---

১ সূরা ত্বহা (২০) : ০৫
২ সূরা আল-হাদীদ (৫৭) : ০৪
৩ সূরা আল-মুলক (৬৭) : ১৬

আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কে?' সে বলল, 'আপনি আল্লাহর রাসূল।' তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তাকে মুক্তি দিয়ে দাও। কারণ, সে একজন ঈমানদার নারী'।[১]

দেখা যাচ্ছে, দাসীটাকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো আল্লাহ কোথায়, সে জবাব দিলো, আসমানে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এই জবাবকে সঠিক বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাহলে কুরআন, হাদীস এবং মাযহাবের ইমামদের মতামত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ আরশেই আছেন, কিন্তু তাঁর জ্ঞান সর্বব্যাপী।

কুরআনের এই আয়াত স্পষ্ট ঘোষণা করে যে, আল্লাহর জ্ঞানই আমাদের পরিবেষ্টন করে আছে।

"আর আল্লাহ (স্বীয়) জ্ঞানে সবকিছুকে ঘিরে রেখেছেন।[২]*"*

সুতরাং আরজ আলী সাহেব সকল বস্তুর মধ্যে আল্লাহর উপস্থিতি ধরে নিয়ে যে তর্ক তুলেছেন, তা আমরা পুরোপুরি বাতিল ও অসংলগ্ন জ্ঞান থেকে উত্থিত বলে সুস্পষ্টভাবে বলতে পারি।

আরজ আলী সাহেব বলেছেন,

> **"সুপারিশ রক্ষার অর্থই হইল, আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করা। অর্থাৎ স্বয়ং যাহা করিতেন না, তাহাই করা। ঈশ্বর কি কোনো ব্যক্তিবিশেষের অনুরোধ বা সুপারিশে আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কাজ করিবেন না?"**

আরজ আলী সাহেবের এ প্রশ্নটির দুটি দিক আছে। একটি হচ্ছে, কিছু কিছু মানুষের ধারণা যে আল্লাহ তাদের পীর বা ওলীদের সুপারিশের অধিকার দিয়েছেন, তারা সুপারিশ করে মানুষের তাক্বদীরে পরিবর্তন সাধন করে দেবে। কিন্তু এটাও আরজ আলী সাহেবদের ইসলাম সম্পর্কে ভাসা ভাসা জ্ঞান থেকে উত্থিত। কারণ, তিনি

---

১ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৩৭
২ আত তালাক (৬৫) : ১২

জানেন না যে সুপারিশের মালিক আল্লাহ তা'আলা।[১] তিনি দয়াপরবশ হয়ে তাঁর বান্দাগণের মধ্যে যার ওপর তাঁর সন্তুষ্টি রয়েছে তাকে হাশরের দিন অনুমতি দেবেন সুপারিশ করার জন্য, তিনি তখন সুপারিশ করার সুযোগ লাভ করবেন। সত্যিকারের মুসলিম এটা বিশ্বাস করে যে তথাকথিত কবরবাসী কারও জন্য সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখে না, কোনো পীর সাহেবও নয়, কোনো মাছ বা গাছ তো নয়ই। সুতরাং সুপারিশের মূল অধিকার আল্লাহর হাতেই। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করলে সেটা থেকে তার ক্ষমতাহীন হওয়া সাব্যস্ত হয় না। তা ছাড়া সবার সুপারিশের পরে তিনি নিজে এমন অনেককে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন যাদের জন্য কারও সুপারিশ হয়নি, কিন্তু তাদের ঈমান ছিল।[২]

হয়তো আরজ আলী সাহেবদের কাছে সুপারিশকে আল্লাহর ক্ষমতার সীমাবদ্ধকরণ মনে হচ্ছে, কিন্তু বস্তুত কাজটা এ রকম নয়। যিনি মহান, তিনি সব সময় তাঁর কাছে অপরের কাছ থেকে আশা করেন যে কেউ আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করুক আমি তাকে দিই। দুনিয়ার বুকেও সেটা স্পষ্ট। মহান আল্লাহ তা'আলা দাতা, ক্ষমাশীল, দয়াকারী, তাঁর এ নাম ও গুণের দাবি হচ্ছে তাঁর কাছে সবাই প্রার্থনা করুক আর তিনি দেবেন। এর মাধ্যমেই তাঁর মহত্ত্ব ফুটে উঠবে। আরজ আলী সাহেবদের মতো লোকেরা তা কীভাবে বুঝবে?

দ্বিতীয়ত, আরজ আলী সাহেবদের হয়তো মনে হতে পারে যে তাক্বদীর নির্ধারিত থাকলে আবার সুপারিশ করলে সেটা পরিবর্তন কীভাবে হবে? এ হিসেবে আরজ আলী সাহেবের এই প্রশ্নটা 'তাক্বদীর' সম্পর্কিত। তাক্বদীর সম্পর্কে কোনো জ্ঞান না থাকলে যে কেউ এমন বিভ্রান্তিমূলক প্রশ্ন করে বসতে পারে।

তাক্বদীর হলো পূর্বনির্ধারিত। তাহলে প্রশ্ন, আল্লাহই কি নিজের ইচ্ছেমতো তাক্বদীর লিখে মানুষের গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছেন? যদি তা-ই হয়, তাহলে মানুষ পাপ করলে তার দায়ভার তো স্বয়ং আল্লাহর। মানুষ কেন শাস্তি পাবে? ব্যাপারটা আসলে সে রকম নয়। এটা ঠিক যে তাক্বদীর পূর্বনির্ধারিত। কিন্তু এটা জানা আবশ্যক যে, আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন হলেন 'আলিমুল গায়েব' অর্থাৎ 'পূর্বাপরের সকল বিষয়ে সম্যক জ্ঞানী।' তিনি মানুষের সৃষ্টিকর্তা। মানুষকে তিনি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েই

---

১ সূরা আয-যুমার (৩৯) : ৪৪
২ মুসনাদে আহমাদ, ৯২০২

সৃষ্টি করেছেন। যেহেতু মানুষের মেকানিজমের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা এবং তিনি জানেন ভবিষ্যতে ঠিক কী কী হবে, তাই তিনি এও জানেন যে, স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে একজন মানুষ কোন কোন কাজগুলো করতে পারেন। যেহেতু তিনি সে সম্পর্কে অবহিত, তাই তিনি তা লিখে রেখেছেন। তবে তিনি কি ব্যক্তিবিশেষের ফরিয়াদ রাখেন না? রাখেন। এই রাখাটাও তাঁর পূর্বতন তাক্বদীর নির্ধারণের সময় লিখে রেখেছেন। তিনি সেখানে লিখেছেন যে অমুক ব্যক্তি অমুক সমস্যায় পড়বে আর দো'আ করতে সমর্থ হবে, অথবা তার জন্য জীবিত সক্ষমরা দো'আ করবে, অথবা সে সাদাকা করতে পারবে সুতরাং সে দো'আ, সাদাকার কারণে তার বিপদ থেকে মুক্তি ঘটবে, কিন্তু বান্দা তো জানে না তার তাক্বদীরে কী আছে, সে তো মনে করছে এ বিপদই হয়তো তাকে শেষ করে দেবে, কিন্তু আল্লাহ জানেন যে তার আরও সুযোগ রয়েছে; কারণ, এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য সে এমন কিছু কাজ করবে যা তার কাজে লাগবে। সুতরাং "বান্দার দায়িত্ব হচ্ছে কাজ করে যাওয়া, তাক্বদীরে কী লেখা আছে তা খুঁজে বেড়ানো নয়।[১]" আবার কখনো কখনো বিনা সুপারিশেই আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে উদ্ধার করেন, এসবই তাঁর একান্ত দয়া। তাঁর দয়াকে অন্য কেউ নির্ধারণ করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না, বা দয়া না করার জন্যও বলতে পারে না। তবে সেটা ভিন্ন যেটা তিনি বলে দিয়েছেন; যেমন তিনি বলে দিয়েছেন যে নাস্তিক, মুশরিক, কাফির ও মুনাফিকদের তিনি দয়া করবেন না।

ধরুন, আমরা জানি আল্লাহ হলেন ধনভান্ডারের আধার। এখন একজন গরিব লোক যদি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে তার দরিদ্রতা বিমোচনের জন্য এবং দোয়া কবুল হয়ে যদি ওই ব্যক্তির দরিদ্রতা দূর হয়, তাহলে কি এর অর্থ এটাই যে এতে আল্লাহর ইচ্ছার ব্যাঘাত ঘটেছে? বরং আল্লাহ অপার ভান্ডার নিয়ে বসে আছেন। কেউ চাইল আর তিনি দান করলেন। এতে করে তার দয়াশীলতা প্রকাশ পায়।

আরজ আলী সাহেব প্রশ্ন করেছেন,

> **"অন্যান্য ক্ষেত্রে যাহাই হউক না কেন, বিচারক্ষেত্রে 'ন্যায়' ও 'দয়ার' একত্র সমাবেশ অসম্ভব। কেননা, দয়া করিলে ন্যায়কে উপেক্ষা করিতে হইবে এবং ন্যায়কে বজায় রাখিতে হইলে দয়া-মায়া বিসর্জন দিতে হইবে। বলা হয়, আল্লাহ**

---

১ বুখারী, ৪৯৪৫; মুসলিম, ২৬৪৭

> **ন্যায়বান এবং দয়ালু। ইহা কীরূপে সম্ভব? তবে কি তিনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ন্যায়বান আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে দয়ালু?"**

আরজ আলী সাহেব এই প্রশ্নের একটা জায়গায় অবশ্য ঠিক আছেন। তিনি বলেছেন, 'বিচারক্ষেত্রে ন্যায় ও দয়ার একত্র সমাবেশ অসম্ভব।' আসলেও তা-ই। বিচারক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই ন্যায়বান হতে হবে। কিন্তু আরজ আলী দুটোকে পরস্পর বিপরীতমুখী দাঁড় করিয়ে দিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

বিচারক্ষেত্রে একজন বিচারক ন্যায়বান থাকবেন, এটাই স্বাভাবিক। নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটাই তো স্বাভাবিক হওয়ার কথা। একজন বিচারক বিচারক্ষেত্রে যদি ন্যায়বান না-ই থাকেন, তাহলে কী ঘটবে? একজন চোর চুরির শাস্তি পাবে না। ধর্ষক ধর্ষণের শাস্তি পাবে না। অন্যায়কারী খুব সহজেই পার পেয়ে যাবে। তখন কী হবে? সমাজে ন্যায় বলে কিছু থাকবে না। অন্যায় আর পাপে ডুবে যাবে সমাজ।

ধরুন আপনি একজন বিচারক। আপনার সামনে দুজন আসামী আনা হলো। এদের দুজন থেকে যেকোনো একজন আসামী। এখন সাক্ষ্যপ্রমাণের পর, আসামী সাব্যস্ত হওয়ার পরেও আপনি কি আসামীটাকে ছেড়ে দেবেন? যদি দেন, তাহলে একই সাথে আপনি বেশ কিছু অপরাধ করবেন। প্রথমত, আপনি আসামীকে ছেড়ে দিয়ে অন্যায় করেছেন। দ্বিতীয়ত, নির্দোষ লোকটিকে আপনি 'ন্যায়বিচার' থেকে বঞ্চিত করে তার প্রতি নির্দয় হয়েছেন।

কিন্তু যদি আপনি এখানে ন্যায়বিচার করতেন তো কী হতো? আপনি যদি ন্যায়বিচার করতেন তাহলে ন্যায় প্রতিষ্ঠা পেত এবং সাথে সাথে আপনি নির্দোষ লোকটির প্রতিও সদয় হতেন।

দয়ালু হওয়ার মানে এই না যে, আপনাকে চোর-ডাকাত-ধর্ষককে ছেড়ে দিতে হবে; বরং দয়ালু হবার অর্থ এই যে, আপনি আপনার অবস্থানে ন্যায়বান থেকে দয়াপরবশ হবেন।

আল্লাহ তা'আলা যদি বিচারের সময় তাঁর সাথে কৃত অপরাধ, যা একান্তভাবে তাঁর অধিকার, যেমন সাওম পালন না করা, হজ্জ না করা ইত্যাদি অপরাধ ক্ষমা করে দেন, আর নিজের পক্ষ থেকে অধিকারে ছাড় দেওয়া ও ক্ষমা করে দেওয়ার বিষয়টি সারা দুনিয়াতে সভ্যসমাজে প্রশংসিত বিবেচিত হয়ে এসেছে, তাহলে সেখানে কার

কী বলার আছে? অন্যদিকে যদি বিচারের সময় অন্যের ওপর কৃত অপরাধ যেমন চুরি, ডাকাতি ইত্যাদির ব্যাপারে উভয়কে ডেকে বিচারের সময় রাজি ও সন্তুষ্ট করে দিতে পারেন তাহলে আপনি তৃতীয় পক্ষ এ ব্যাপারে কথা বলার কে? বান্দার অধিকারের ব্যাপারে বিচারের মূল উদ্দেশ্যই তো বাদী-বিবাদী উভয়ের সন্তুষ্টি, তৃতীয় পক্ষের সন্তুষ্টি নয়। সুতরাং আরজ আলী সাহেব এখানে সমীকরণ দাঁড় করাতেই ভুল করেছেন। তিনি নৈতিকতার সাথে অনৈতিকতাকে গুলিয়ে জগাখিচুড়ি তৈরি করেছেন বলা যায়।

আরেক স্থানে আরজ আলী সাহেব লিখেছেন,

> **"বলা হয় যে, আল্লাহর অনিচ্ছায় কোন ঘটনা ঘটে না। এমনকি গাছের পাতাও নড়ে না। বিশেষত, তাহার অনিচ্ছায় যদি কোন ঘটনা ঘটিতে পারে, তাহা হইলে তাহার 'সর্বশক্তিমান' নামের সার্থকতা কোথায়? আর যদি আল্লাহর ইচ্ছায়ই সকল ঘটনা ঘটে, তবে জীবের দোষ বা পাপ কী?"**

এই ব্যাপারটাও তাকদীর সম্পর্কিত। আরজ আলী মাতুব্বরের যে তাকদীর সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই ছিল না, এই প্রশ্নগুলো তারই বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ সর্বশক্তিমান মানে এই নয় যে, জীব তথা মানুষের দোষ বা পাপ কেবল তাঁর ইচ্ছাতেই ঘটে চলেছে। আগেই বলেছি, আল্লাহ মানুষকে একটি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।

আবার, আল্লাহ হলেন 'আলিমুল গায়েব' বা 'ভবিষ্যদ্রষ্টা'। তিনি মানুষের সৃষ্টিকর্তা। মানুষের মেকানিজম তিনিই তৈরি করেছেন। তিনিই মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন। এখন, তিনি যেহেতু ভবিষ্যদ্রষ্টা অর্থাৎ ভবিষ্যৎ দেখতে পান, তাই তিনি জানেন এই স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে মানুষ কী কী কাজ করবে। তাই আল্লাহ সেই কাজগুলোকে তিনি লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন ভাগ্যলিপি হিসেবে। এটাই সাধারণ অর্থে তাকদীর। এর মানে এই না যে, আল্লাহ লিখে রেখেছেন বলেই মানুষ সেই কাজগুলো করছে; বরং এর মানে এই যে, আল্লাহ আলিমুল গায়েব। তিনি জানেন ভবিষ্যতে কী হবে আর কে কী করবে। তিনি জানেন বলেই সেগুলো লিখে রেখেছেন, ব্যস!

একটা সহজ উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরা যাক একটি স্কুলের একজন ম্যাথ টিচারের আন্ডারে পাঁচ জন ছাত্র আছে। ম্যাথ টিচার জানে এই পাঁচ জনের মধ্যে কার মেধা

কতটুকু। ম্যাথে কার দক্ষতা কতটুকু সেসব ম্যাথ টিচার খুব ভালো করেই জানেন। এখন ধরুন, পরীক্ষার আগে সেই ম্যাথ টিচার একটি কুপনে ওই পাঁচ জনের নাম এবং আসন্ন পরীক্ষায় ম্যাথে ওই পাঁচ জনের কে কী রকম মার্কস পাবে তাও লিখে রাখলেন। ধরুন, সেটা এ রকম :

রাকিব : ৯০
রাব্বি : ৯৫
সিয়াম : ৮২
রাশেদ : ৭০
এবং মুরাদ : ৫৫

আবার ধরুন, পরীক্ষা শেষে দেখা গেল ম্যাথ টিচার ঠিক যে ফলাফল আগে লিখে রেখেছিলেন, প্রত্যেকে ঠিক সেই পরিমাণ মার্কসই পেয়েছে।

তাহলে প্রশ্ন : ম্যাথ টিচার আগে থেকেই লিখে রেখেছে বলেই কি ওই পাঁচ জন এ রকম রেজাল্ট করেছে? উত্তর হলো : 'না'।

ম্যাথ টিচার আগে থেকেই তাদের মেধা সম্পর্কে জানতেন বলেই তিনি অনুমান করতে পেরেছেন কে কী রকম রেজাল্ট করবে। তাই তিনি লিখে রেখেছেন। এতে করে এটা প্রমাণ হয় না যে ম্যাথ টিচার লিখে রেখেছেন বলেই ছাত্ররা এ রকম রেজাল্ট করেছে। ঠিক সেভাবে, আল্লাহও আগে থেকে জানেন বলেই তিনি মানুষের ভাগ্য লিখে রেখেছেন। এতে করে এটা প্রমাণ হয় না যে আল্লাহ লিখে রেখেছেন বলেই মানুষ দোষ বা পাপগুলো করছে।

কেউ কেউ প্রশ্ন করবেন, ম্যাথ টিচারের অনুমান তো ভুলও হতে পারে। জি, ম্যাথ টিচারের অনুমান ভুল হতেই পারে। কারণ, তিনি ভবিষ্যৎ দেখতে পারেন না। তিনি ভবিষ্যৎ জানেন না। তিনি স্রেফ অনুমান করতে পারেন। এ জন্য তার জানায়, তার অনুমানে ভুল হতেই পারে। কিন্তু আল্লাহ তো এ রকম নন। তিনি ভবিষ্যৎ জানেন। তাই তাঁর জানায় কোনো ভুল হতে পারে না। আরজ আলী সাহেব এখানে তাক্বদীর সম্পর্কে না জেনে, পড়াশুনা না করেই প্রশ্ন করে বসেছেন। এখানে একটি বিষয় জানানো জরুরি মনে করছি, তা হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছা দু-ধরনের :

১। কাউনিয়্যাহ বা প্রাকৃতিক
২। শারইয়্যাহ বা শরী'আতগত

১। **কাউনিয়্যাহ :** এ ধরনের ইচ্ছা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাকৃত জিনিসটি সম্পন্ন হয়। তবে জিনিসটি আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় হওয়ার ব্যাপারটি জরুরি নয়। আর এটা দ্বারাই আল্লাহর 'মাশিয়াত' বা ইচ্ছা বোঝানো হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُوا۟ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٢٥٣﴾ البقرة

"আল্লাহ চাইলে তারা পরস্পরে লড়াই করতে পারত না, কিন্তু আল্লাহ যা চান তা-ই করেন।[১]"

إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ ۚ هُوَ رَبُّكُمْ هود ﴿٣٤﴾

"যদি আল্লাহই তোমাদের বিভ্রান্ত করতে চান (তাহলে কোনো নসিহতই কাজে আসবে না)। তিনিই হচ্ছেন তোমাদের রব।[২]"

২। **শারইয়্যাহ :** এ ধরনের ইচ্ছা দ্বারা আল্লাহর ইচ্ছাকৃত জিনিসটি সম্পন্ন হওয়া অপরিহার্য নয়। তবে এ ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত জিনিস বা বিষয়টি তাঁর পছন্দনীয় হতে হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ النساء ﴿٢٧﴾

"আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিতে চান।[৩]"

আমরা আরও ঈমান আনি যে, আল্লাহ তা'আলার কাউনী এবং শার'য়ী উভয় ইচ্ছাই তাঁর হিকমতের অধীন। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কাউনী ইচ্ছানুযায়ী যা ফয়সালা করেন অথবা শার'য়ী ইচ্ছানুযায়ী বান্দা [মাখলুক] যে ইবাদত করে উভয় ক্ষেত্রেই

---

১ সূরা বাকারা (০২) : ২৫৩
২ সূরা হূদ (১১) : ৩৪
৩ সূরা নিসা (০৪) : ২৭

তাঁর হিকমত নিহিত রয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহর হিকমতের কিছু আমরা বুঝতে সক্ষম হই বা না হই অথবা আমাদের বিবেক-বুদ্ধি এ ক্ষেত্রে অক্ষম হলেও কিছু যায় আসে না। [সর্বাবস্থাতেই তিনি সবচেয়ে বড় হাকীম]

أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكَمِ ٱلْحَٰكِمِينَ ﴿٨﴾ التين ﴿٨﴾

"আল্লাহ কি সবচেয়ে বড় হাকীম নন?[১]"

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾ المائدة ﴿٥٠﴾

"যারা আল্লাহর প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়ী তাদের কাছে আল্লাহর চেয়ে উত্তম হুকুমের অধিকারী আর কে হতে পারে?[২]"

আমরা ঈমান আনি যে,

ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾ لَّهُۥ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ الزمر ﴿٦٢﴾ ﴿٦٣﴾

"আল্লাহ তা'আলা সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা। তিনি সবকিছুরই অভিভাবক। আসমান ও যমীনের ধন-ভান্ডারের চাবি তাঁরই কাছে সংরক্ষিত।[৩]"

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এবং তাঁর বান্দার পক্ষ থেকে যা কিছু সংঘটিত হবে, তা চাই কথা হোক, কাজ হোক অথবা অমান্য করাই হোক না কেন এর সবকিছুই উক্ত চারটি স্তরের অন্তর্ভুক্ত। এর সবই তাঁর জানা এবং তাঁর কাছে লেখা রয়েছে। এর সবকিছুই তাঁর ইচ্ছা ও সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত।

لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢٩﴾ التكوير ﴿٢٨﴾ ﴿٢٩﴾

---

১ সূরা তীন (৯৫) : ৮
২ সূরা মায়েদা (০৫) : ৫০
৩ যুমার (৩৯) : ৬২-৬৩

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সোজা-সরল পথে চলতে চায় (তার জন্য এ কিতাব উপদেশস্বরূপ) আর যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা না চান ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের চাওয়ায় কিছুই হয় না।[১]"

وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٧﴾ الأنعام ﴿١٣٧﴾

"আল্লাহ চাইলে তারা এ রকম করত না। কাজেই তাদের ছেড়ে দাও। নিজেদের মিথ্যা রচনায় তারা নিমগ্ন থাকুক।[২]"

وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُوا۟ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٢٥٣﴾ البقرة ﴿٢٥٣﴾

"আল্লাহ চাইলে তারা কখনো লড়াই করত না। কিন্তু আল্লাহ যা চান তা-ই করেন।[৩]"

وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ الصافات ﴿٩٦﴾

"আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা করো তাও সৃষ্টি করেছেন।[৪]"

এরপরও আমরা ঈমান আনি, যেকোনো কাজ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাকে এখতিয়ার এবং কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন। **বান্দার কাজ যে তার এখতিয়ার এবং ক্ষমতায় সংঘটিত হয়ে থাকে তার কিছু প্রমাণ :**

১. আল্লাহ তা'আলার বাণী :

فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ البقرة ﴿٢٢٣﴾

"তোমাদের ইচ্ছামাফিক তোমাদের ক্ষেত্র [স্ত্রীদের কাছে] গমন করো।[৫]"

---

১ সূরা তাকওয়ীর (৮১) : ২৮-২৯
২ সূরা আন'আম (০৬) : ১৩৭
৩ সূরা বাকারাহ (০২) : ২৫৩
৪ সূরা সাফফাত (৩৭) : ৯৬
৫ সূরা বাকারাহ (০২) : ২২৩

وَلَوْ أَرَادُوا۟ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا۟ لَهُۥ عُدَّةً التوبة ﴿٤٦﴾

"তারা যদি বের হওয়ার ইচ্ছা সত্যিই পোষণ করত, তাহলে তারা অবশ্যই সে জন্য কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করত।[১]"

উক্ত আয়াত দুটিতে বান্দার ইচ্ছা পোষণ করা এবং ইচ্ছানুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ করার ব্যাপারটি প্রমাণিত হয়েছে।

২. যদি বান্দার কাজ করার কোনো এখতিয়ার ও ক্ষমতাই না থাকে তাহলে বিধি-নিষেধ পালনের ক্ষেত্রে যে নির্দেশ ও উপদেশ বান্দাকে দেয়া হয়েছে তার অর্থ দাঁড়ায়, বান্দাকে এমন কাজের প্রতি নির্দেশ দেয়া, যা করার কোনো ক্ষমতাই তার নেই। অথচ এমনটি হওয়া সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর করুণা, হিকমত ও কৌশলের পরিপন্থী। সাথে সাথে আল্লাহর এ ঘোষণার সম্পূর্ণ বিপরীত :

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا البقرة ﴿٢٨٦﴾

"আল্লাহ কারও ওপরই তার শক্তি-সামর্থ্যের অধিক বোঝা চাপিয়ে দেন না।[২]"

৩. মুহসীন ব্যক্তির ইহসানের প্রশংসা এবং খারাপ ব্যক্তির খারাপ কাজের নিন্দা করা আর উভয়কেই তার কৃতকর্মের প্রাপ্য পুরস্কার বা শাস্তিপ্রদানের বিষয়টিও এ ক্ষেত্রে একটি দলীল। যদি বান্দার কর্ম তার ইচ্ছা ও এখতিয়ার অনুযায়ী কোনো কাজ সংঘটিত না-ই হতো তাহলে মুহসিন ব্যক্তির ইহসানের প্রশংসা করার কোনো অর্থই হয় না। আর অন্যায়কারীর অন্যায়ের জন্য শাস্তিপ্রদান যুলুম ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা কোনো অর্থহীন কাজ করা এবং যুলুম করা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

৪. আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন

مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾ النساء ﴿٤﴾

---

১ সূরা তাওবা (০৯) : ৪৬
২ সূরা বাকারা (০২) : ২৮৬

"সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে। যেন তাঁদের পাঠাবার পর আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে লোকদের কোনো যুক্তি না থাকে। আল্লাহ তো সর্বাবস্থায় মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[১]"

কাজ সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে যদি বান্দার ইচ্ছা ও শক্তি কাজে লাগানোর কোনো এখতিয়ারই না থাকে তাহলে রাসূল পাঠানোর মাধ্যমে আল্লাহর বিরুদ্ধে বান্দার হুজ্জত (যুক্তি) বাতিল বলে গণ্য হতো না।

৫. কার্য সম্পাদনকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই কাজ করার সময় কোনো রকম জবরদস্তির অনুভূতি ও ধারণা পোষণ করা ছাড়াই কাজ করে। সে দাঁড়ায়, বসে, প্রবেশ করে, বের হয়, সফর করে, আবার মুকীম হয় সম্পূর্ণ তার নিজ ইচ্ছানুযায়ী। সে এ কথা মনে করে না যে, কেউ তাকে এসব করার জন্য বাধ্য করছে কিংবা জবরদস্তি করছে। বরং বান্দা নিজেই স্বতঃস্ফূর্ত কাজ আর জবরদস্তিমূলক কাজের মধ্যে বাস্তব পার্থক্য বের করে। এমনিভাবে শরী'আত ও এ দু-ধরনের কাজের মধ্যে পার্থক্য করে থাকে। ফলে জবরদস্তির শিকার হয়ে যদি বান্দা আল্লাহর হকের ব্যাপারে কোনো কাজ করে ফেলে তাহলে এর জন্য কোনো শাস্তি হবে না।

আমরা মনে করি পাপী ব্যক্তির জন্য তার পাপ কাজের পক্ষে 'তাকদীর' দ্বারা যুক্তি পেশ করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ, পাপী তার নিজ এখতিয়ার ও শক্তির বলে পাপ কাজ করে অথচ সে জানে না যে পাপকর্মটি তার 'তাকদীরে' আল্লাহ তা'আলা লিখেছেন কি না। যেকোনো কাজ নিজ এখতিয়ার ও ক্ষমতাবলে সমাপ্ত করার পূর্ব পর্যন্ত কেউ জানতে পারে না যে সংশ্লিষ্ট কাজটি আল্লাহ তা'আলা তার 'তাকদীরে' লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন কি না।

وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا لقمان ۝٣٤

"কেউ জানে না আগামীকাল সে কী কামাই করবে।[২]"

তাহলে কোনো কাজ করা বা না-করার ক্ষেত্রে অপারগতা অথবা অক্ষমতার যুক্তি

---

১ নিসা (০৪) : ১৬৫
২ সূরা লোকমান (৩১) : ৩৪

[অর্থাৎ আল্লাহ চাইলে করতাম, না চাইলে করতাম না] দেখানো কীভাবে সঠিক হতে পারে? তাই আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের যুক্তি দেখানোর বিষয়টি বাতিল ঘোষণা করেছেন :

سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكْنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَىْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا۟ بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ ۖ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾ الأنعام ﴿١٤٨﴾

"মুশরিক লোকেরা অচিরেই একথা বলবে, যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে আমরা শিরক করতাম না। আমাদের বাপ-দাদারাও শিরক করত না। আর আমরা কোনো জিনিসকে হারাম করতাম না। বস্তুত এ ধরনের কথা বলে তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা সত্যে মিথ্যারোপ করেছিল। এদের বলো, তোমাদের কাছে এমন কোনো জ্ঞান আছে কি, যা আমাদের সামনে পেশ করার মতো? তোমরা তো কেবল ধারণা আর অনুমানের ওপর চলো। আর ভিত্তিহীন ধারণার জন্ম দিয়ে চলেছ।[১]"

যে পাপী ব্যক্তি তাক্বদীরের দোহাই দেয়, তাকে আমরা বলতে চাই, আনুগত্য বা নেক কাজ করাকে আপনি আপনার তাক্বদীরের লিখন বলছেন না কেন। আল্লাহ তা'আলা তো নেক কাজই আপনার তাক্বদীরে লিখে রেখেছেন। আপনার দ্বারা কোনো কাজ সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে পাপ-পুণ্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কারণ, তাক্বদীরের লিখন তো আপনার অজানা। অর্থাৎ পাপ করে আপনি যেভাবে তাক্বদীরের লিখন বলে চালিয়ে দিচ্ছেন, পুণ্য কাজ করেও তাক্বদীরের লিখন বলে চালিয়ে দিতে পারবেন। এ জন্যই সাহাবায়ে কিরামকে যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়ে দিলেন, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই জান্নাত কিংবা জাহান্নামের স্ব-স্ব স্থান লিপিবদ্ধ রয়েছে তখন তাঁরা বললেন, আমরা কি তাহলে তাক্বদীরের ওপর ভরসা করে আমল বাদ দিয়ে দেবো? তিনি উত্তরে বললেন, বরং তোমরা আমল করতে থাকো। যার জন্য যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য সে কাজ সহজ।

তাকদীরের দোহাই দিয়ে যে ব্যক্তি পাপকাজ করে তাকে আমরা বলতে চাই, আপনি যদি মক্কা শরীফ সফর করতে চান, আর সেখানে যাওয়ার জন্য যদি দুটি পথ থাকে,

১ সূরা আন'আম (০৬) : ১৪৮

আর একজন সত্যবাদী সংবাদদাতা আপনাকে জানাল যে, মক্কার একটি পথ খুবই বিপজ্জনক ও দুর্গম, আর একটি পথ সোজা এবং নিরাপদ, তাহলে আপনি নিশ্চয়ই দ্বিতীয় পথটি অবলম্বন করবেন। প্রথম পথটি অবলম্বন করা আপনার জন্য আদৌ ঠিক নয়। কিন্তু প্রথম পথটি অবলম্বন করে যদি আপনি একথা বলেন, আমার তাক্বদীরে এটাই লিখা ছিল তাহলে অবশ্যই লোকেরা আপনাকে পাগল বলে গণ্য করবে।

আমরা আরও বলতে চাই, আপনার কাছে যদি এমন দুটি চাকরির প্রস্তাব পেশ করা হয় যার একটি হচ্ছে অধিক বেতনের (অপরটি স্বল্প বেতনের) তাহলে আপনি বেশি বেতনের চাকরিটাই গ্রহণ করবেন। তাহলে আখেরাতের আমলের ক্ষেত্রে আপনি কীভাবে নিম্নমানের কাজ করাকে বেছে নেবেন? তারপর বলবেন এটাই তাক্বদীরের লিখন?

তাকে আরও বলতে চাই, আমরা দেখতে পাই আপনার যখন কোনো শারীরিক রোগ দেখা দেয়, তখন চিকিৎসার জন্য আপনি সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ডাক্তারের দরজায় ধরনা দেন। তারপর অপারেশনের যত ব্যথা তা সহ্য করেন। ওষুধ খাওয়ার যাবতীয় ঝামেলাকে বরদাস্ত করেন। তাহলে অসংখ্য গুনাহর দ্বারা আপনার অন্তরে যে রোগের উৎপত্তি হয়েছে তা থেকে মুক্তিলাভের জন্য কেন আপনি সে রকমটি করেন না?

আমরা ঈমান আনি যে, বান্দাদের প্রতি আল্লাহর অপরিসীম রহমত ও পূর্ণ হিকমতের কারণে কোনো খারাপ কাজকেই আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত করা যায় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

“

والشرليسإليك

“খারাপ তোমার দিকে বর্তাবে না।”

আল্লাহর ফায়সালা নিজে কখনো খারাপ হতে পারে না। কেননা, ফায়সালাটির পেছনে কোনো না-কোনো কল্যাণ ও হিকমত নিহিত আছে। অনিষ্ট বা ত্রুটি মূলত আল্লাহর ফায়সালার নয়; বরং ফায়সালাকৃত জিনিস বা বিষয়টির সাথে সম্পৃক্ত। এর প্রমাণ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী :

“

وقني شرّ ما قضيت

“হে আল্লাহ, তোমার ফায়সালাকৃত জিনিসের অনিষ্ট হতে আমাকে বাঁচাও।[১]”

এ বাক্যটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসানকে [রাদিয়াল্লাহু আনহু] দু'আয়ে কুনুতের অংশ হিসেবে শিখিয়েছেন।

এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনিষ্ট কথাটি আল্লাহ তা'আলার ফায়সালাকৃত জিনিসের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। তাই অনিষ্ট বা দোষ মূলত ফায়সালাকৃত বিষয়ের। তবে নিছক অনিষ্টই এর মূল কথা নয়। এক দিক থেকে খারাপ হলেও আবার অপর দিক থেকে এর মধ্যে কোনো না-কোনো কল্যাণ নিহিত আছে।

দুনিয়ার বিপর্যয়, যেমন : দুর্ভিক্ষ, রোগ-ব্যাধি, অভাব-অনটন, ভয়-ভীতি ও আতঙ্ক ইত্যাদি খারাপ বটে, কিন্তু অন্য দিক থেকে বিচার করলে এগুলোর মধ্যেও কল্যাণ খুঁজে পাওয়া যাবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন :

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ الروم ﴿٤١﴾

“লোকদের নিজেদের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও জলে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। যেন তাদের নিজেদের কৃতকর্মের স্বাদ ভোগ করাতে পারেন। এর ফলে হয়তো তারা (আল্লাহর পথে) ফিরে আসবে।[২]”

চোরের হাত কাটা, ব্যভিচারীর রজম অর্থাৎ পাথর মেরে মৃত্যুদণ্ড দেয়া, চোর এবং ব্যভিচারীর নিজের জন্য অনিষ্টকর হতে পারে। কেননা, চোর তার হাত হারাচ্ছে আর ব্যভিচারী তার জীবন হারাচ্ছে। কিন্তু অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে দেখা যাবে এর মধ্যেও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আর তা হচ্ছে, তাদের উভয়ের পাপের

১ আবু দাউদ
২ সূরা রূম (৩০) : ৪১

কাফফারা হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের শাস্তি একত্র করা হবে না। অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে এর আরও একটি কল্যাণকর দিক রয়েছে। তা হচ্ছে, এ বিধান প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের ধন-সম্পদ, মান-ইজ্জত এবং বংশ রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে।

''ঈমান বিল ক্বদার'' বা তাক্বদীরের প্রতি ঈমান স্থাপন করার কারণে মানুষের কর্মসমূহের ওপর তার ইচ্ছা ও ক্ষমতার বিষয়টি সাংঘর্ষিক নয়। কেননা, শরী'আত ও বাস্তব অবস্থা বান্দার নিজস্ব যে ইচ্ছাশক্তি রয়েছে তা সাব্যস্ত করে।

১। শরীয়াতের প্রমাণ :

আল্লাহ তা'আলা বান্দার ইচ্ছাপ্রসঙ্গে বলেন,

ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُّ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ مَـَٔابًا ﴿٣٩﴾ النبا ﴿٣٩﴾

"এই দিবস সত্য। সুতরাং যার ইচ্ছা সে তার রবের নিকট তার ঠিকানা তৈরি করুক।[১]"

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ البقرة ﴿٢٢٣﴾

"অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে (স্ত্রীদের কাছে) যেভাবে ইচ্ছা গমন করো।[২]"

আল্লাহ তা'আলা বান্দার সামর্থ্য সম্পর্কে আরও বলেন,

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ التغابن ﴿١٦﴾

''অতএব তোমরা আল্লাহর যথাসাধ্য তাকওয়া অবলম্বন করো।[৩]"

---

১ সূরা আন-নাবা (৭৮) : ৩৯
২ সূরা আল-বাক্বারা (০২) : ২২৩
৩ সূরা আত-তাগাবুন (৬৪) : ১৬

আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا البقرة ﴿٢٨٦﴾

"আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের দায়িত্ব দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার ওপর বর্তায় যা সে করে।[১]"

২। বাস্তবতার আলোকে এর প্রমাণ :

প্রত্যেক মানুষ জানে যে, তার নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি ও সামর্থ্য রয়েছে এবং এরই মাধ্যমে সে কোনো কাজ করে বা তা থেকে বিরত থাকে। যেসব কাজ তার ইচ্ছায় সংঘটিত হয় যেমন, চলাফেরা করা এবং যা তার অনিচ্ছায় হয়ে থাকে যেমন, হঠাৎ করে শরীর প্রকম্পিত হওয়া এ উভয় অবস্থার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা সে পার্থক্যও করতে পারে।

তবে বান্দার ইচ্ছা ও সামর্থ্য আল্লাহর ইচ্ছা ও সামর্থ্যের অধীন ও অনুগত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾ التكوير ﴿٢٩﴾﴿٢٨﴾

''যে সরল পথে চলার ইচ্ছা করে (এ ঘোষণা) তার জন্য, আর আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের ইচ্ছার বাইরে তোমাদের কোনো ইচ্ছা কার্যকর হতে পারে না।[২]"

যেহেতু সমগ্র বিশ্বজগৎ আল্লাহ তা'আলার রাজত্ব, তাই তাঁর রাজত্বে তাঁর অজানা কিছু ঘটতে পারে না।

আমাদের উল্লিখিত বর্ণনানুযায়ী তাক্বদীরের ওপর বিশ্বাস বান্দাকে তার ওপর অর্পিত ওয়াজিব আদায় না করার অথবা তাক্বদীরের কথা বলে পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কোনো সুযোগ প্রদান করে না। সুতরাং তাক্বদীরের ওপর বিশ্বাস করে এই ধরনের যুক্তি উপস্থাপন করা কয়েকটি কারণে বাতিল বলে বিবেচিত হবে। তন্মধ্যে কয়েকটি প্রমাণ নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

১ সূরা আল-বাক্বারা (০২) : ২৮৬
২ সূরা তাকওয়ীর (৮১) : ২৮-২৯

এক

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكْنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَىْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا۟ بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ ۖ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾ الانعام ﴿١٤٨﴾

"যারা শির্ক করছে তারা অচিরেই বলবে, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তবে আমরা এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণ শির্ক করতাম না এবং না আমরা কোনো বস্তুকে হারাম করতাম। এমনিভাবে তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছে, শেষ পর্যন্ত তারা আমার শাস্তি আস্বাদন করেছে। আপনি বলুন, তোমাদের কাছে কি কোনো প্রমাণ আছে, যা আমাদের দেখাতে পারো? তোমরা শুধু আন্দাজের অনুসরণ করো এবং তোমরা শুধু অনুমান করে কথা বলো।[১]"

এতে বোঝা গেল, পাপকাজ করার জন্য তাক্বদীরকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যদি বৈধ হতো তবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার কারণে শাস্তি দিতেন না।

দুই

আল্লাহ বলেন,

رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾ النساء ﴿١٦٥﴾

"রাসূলগণকে সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মতো কোনো অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।[২]"

যদি তাক্বদীর পথভ্রষ্ট লোকদের জন্য পাপকাজ করার প্রমাণ হতো তাহলে নবী-রসূলগণ প্রেরিত হওয়ার পর এ প্রমাণকে উঠিয়ে নেওয়া হতো না। কেননা, নবী

১ সূরা আল-আন'আম (০৬) : ১৪৮
২ সূরা আন-নিসা (০৪) : ১৬

এবং রাসূলগণের আগমনের পরেও অবাধ্যতা তাক্বদীরের কারণে সংঘটিত হচ্ছে।

তিন

আলী ইবন আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে,

“

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কোনো লোক নেই, যার ঠিকানা জান্নাতে বা জাহান্নামে লেখা হয়নি। উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে এক লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল, তাহলে আমরা কি ভাগ্যের ওপর তাওয়াক্কুল তথা ভরসা করে থাকব না? রাসূলুল্লাহ তদুত্তরে বললেন, না, আমল করতে থাকো, যাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে তা সহজ পাবে।[১]

তারপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পাঠ করলেন :

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۝ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۝ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۝ الليل ۝

“আর যে দান করে, আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যা উত্তম তা সত্য বলে মেনে চলে, আমরা তার জন্য সুগম করে দেবো সহজ পথ।[২]”

সহীহ মুসলিমের হাদীসে এভাবে এসেছে যে,

“

كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ

“যে যার জন্য সৃষ্ট তা তার জন্য সহজ।”

তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলকে কাজ করে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাক্বদীরের ওপর ভর করে থাকতে নিষেধ করেছেন।

---

১ সহীহ বুখারী ও মুসলিম
২ সূরা আল-লাইল (৯২) : ৫-৭

চার

আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে কতিপয় বিষয়ের আদেশ এবং কতিপয় বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন। তাকে তার ক্ষমতা ও সাধ্যের বাইরে কিছুই করতে বলেননি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ التغابن ﴿١٦﴾

"অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো।[১]"

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا البقرة ﴿٢٨٦﴾

"আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের দায়িত্ব দেন না।[২]"

যদি বান্দা কোনো কাজ করার ক্ষেত্রে বাধ্যই থাকত, তাহলে তাকে তার সাধ্য ও ক্ষমতার বহির্ভূত এমন কাজের নির্দেশ দেওয়া হতো যা থেকে তার রেহাই পাওয়ার কোনো উপায় থাকত না। আর সেটা বাতেল। তাই বান্দা ভুল, অজ্ঞতাবশত অথবা জোরপূর্বক অনিচ্ছাকৃত কোনো অপরাধ করলে তাতে তার পাপ হয় না।

পাঁচ

আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত তাক্বদীর সম্পর্কে বান্দার কোনো জ্ঞান নেই। তাগায়েবী জগতের এক গোপন রহস্য। তাক্বদীরের বিষয় সংঘটিত হওয়ার পরই কেবল বান্দা তা জানতে পারে। বান্দার ইচ্ছা তার কাজের পূর্বে হয়ে থাকে; তাই তার ইচ্ছা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত তাক্বদীর জানার ওপর ভিত্তি করে হয় না। এমতাবস্থায় তাক্বদীরের দোহাই দেওয়ার কোনো অর্থ হয় না। আর যে বিষয় বান্দার জানা নেই সে বিষয়ে তার জন্য প্রমাণ হতে পারে না।

---

১ সূরা আত-তাগাবুন (৬৪) : ১৬
২ সূরা বাক্বারা (০২) : ২৮৬

ছয়

আমরা লক্ষ করি, মানুষ পার্থিব বিষয়ে সদাসর্বদা যথোপযুক্ত ও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে আগ্রহী হয়ে থাকে। কখনো ক্ষতিকর ও অলাভজনক কাজে পা বাড়ায় না এবং তখন তাক্বদীরের দোহাইও দেয় না। তা হলে ধর্মীয় কাজে উপকারী দিক ছেড়ে দিয়ে ক্ষতিকর ও নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়ে তাক্বদীরের দোহাই দেওয়া হয় কেন? ব্যাপারটা কি উভয় ক্ষেত্রে এক নয়?

প্রিয় পাঠক, আপনার সম্মুখে দুটি উদাহরণ পেশ করছি যা বিষয়টি স্পষ্ট করে দেবে, ইন শা আল্লাহ :

প্রথম উদাহরণ :

যদি কারও সামনে দুটি পথ থাকে। এক পথ তাকে এমন এক দেশে নিয়ে পৌঁছাবে যেখানে শুধু নৈরাজ্য, খুন-খারাবি, লুটপাট, ভয়-ভীতি ও দুর্ভিক্ষ বিরাজমান। দ্বিতীয় পথ তাকে এমন স্বপ্নের শহরে নিয়ে যাবে যেখানে শৃঙ্খলা-নিরাপত্তা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও জান-মালের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিদ্যমান। এমতাবস্থায় সে কোন পথে চলবে? নিশ্চিতভাবে বলা যাবে যে, সে দ্বিতীয় পথে চলবে। যে পথে শান্তি ও আইন-শৃঙ্খলা বলবৎ রয়েছে। কোনো বুদ্ধিমান লোক প্রথম পথে পা দিয়ে ভাগ্যের দোহাই দেবে না। তাহলে মানুষ আখিরাতের ব্যাপারে জান্নাতের পথ ছেড়ে জাহান্নামের পথে চলে ক্বদরের দোহাই দেবে কেন?

দ্বিতীয় উদাহরণ :

রোগীকে ওষুধ সেবন করতে বললে তা তিক্ত হলেও সে সেবন করে। বিশেষ ধরনের কোনো খাবার খেতে নিষেধ করা হলে তা সে খায় না, যদিও তার মন তা খেতে চায়। এসব শুধু নিরাময় ও রোগমুক্তির আশায় এবং সে তাক্বদীরের দোহাই দিয়ে ওষুধ সেবন থেকে বিরত থাকে না বা নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ করে না।

তাহলে মানুষ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশাবলি বর্জন এবং নিষেধাবলি অমান্য করে তাক্বদীরের দোহাই দেবে কেন?

সাত

যে ব্যক্তি তার ওপর অর্পিত ওয়াজিব কাজসমূহ ত্যাগ করে অথবা পাপকাজ করে তাক্বদীরের দোহাই দিয়ে থাকে অথচ তার ধন-সম্পদ বা মান-সম্মানে কেউ যদি আঘাত হেনে বলে, এটাই তোমার তাক্বদীরে লেখা ছিল, আমাকে দোষারোপ কোরো না, তখন সে তার যুক্তি গ্রহণ করবে না। তাহলে কেমন করে সে তার ওপর অন্যের আক্রমণের সময় তাক্বদীরের দোহাই স্বীকার করে না। তাহলে কেন সে আল্লাহর অধিকারে আঘাত হেনে তাক্বদীরের দোহাই দেবে?

উল্লেখ্য, একদা উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এর দরবারে এক চোরকে হাজির করা হয়। তার হাত কর্তনের নির্দেশ দেওয়া হলে সে বলে, হে আমিরুল মু'মিনীন, থামুন, আল্লাহ তাক্বদীরে লিখে রেখেছেন বলে আমি চুরি করেছি। উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমরাও আল্লাহ তাক্বদীরে লিখে রেখেছেন বলে হাত কর্তনের নির্দেশ দিয়েছি।

তাক্বদীরের ওপর ঈমানের বহুবিধ ফল রয়েছে তন্মধ্যে বিশেষ কয়েকটি হলো :

১।ঈমান বিল ক্বাদর দ্বারা উপায়-উপকরণ গ্রহণকালে ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ওপর তাওয়াক্কুল ও ভরসার সৃষ্টি হয় এবং সে তখন শুধু উপায়-উপকরণের ওপর নির্ভরশীল হয় না। কেননা, প্রতিটি বস্তুই আল্লাহ তা'আলার তাক্বদীরের আওতাধীন।

২। ব্যক্তির কোনো উদ্দেশ্য সাধিত হলে সে তখন নিজেকে নিয়ে গর্ববোধ করে না। কারণ, যা অর্জিত হয়েছে তা সবই আল্লাহর নে'আমত। যা তিনি কল্যাণ ও সাফল্যের উপকরণ দ্বারা নির্ধারণ করে রেখেছেন। আর ব্যক্তি নিজ কর্মের জন্য আত্মম্ভরি হলে এই নি'আমতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে ভুলে যায়।

৩। ঈমান বিল ক্বাদর দ্বারা বান্দার ওপর আল্লাহর তাক্বদীর অনুযায়ী যা কার্যকর হয় তাতে তার অন্তরে প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততা অর্জিত হয়। ফলে সে কোনো প্রিয় বস্তু হারালে বা কোনো প্রকার কষ্ট ও বিপদাপদে পতিত হলে বিচলিত হয় না। কারণ, সে জানে, সবকিছুই সেই আল্লাহর তাক্বদীর অনুযায়ী ঘটছে যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর মালিক। যা ঘটবার তা ঘটবেই।

এ প্রসঙ্গো আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا۟ بِمَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾ الحديد ﴿٢٣﴾ ﴿٢٢﴾

"পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজেদের ওপর যেসব বিপদাপদ আসে জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই তা একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর পক্ষে অতি সহজ। এটা এ জন্য, যাতে তোমরা যা হারিয়ে ফেলো তজ্জন্য দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন, সেজন্য উল্লসিত না হয়ে ওঠো। আল্লাহ কোনো উদ্ধত-অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না।[১]"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"

''মুমিনের ব্যাপারে আশ্চর্য হতে হয়, তার সব ব্যাপারেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। একমাত্র মুমিনের ব্যাপারেই তা হয়ে থাকে। আনন্দের কিছু হলে সে শুকরিয়া জ্ঞাপন করে, তখন তা তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। আর যখন তার ওপর কোনো ক্ষতিকর বিষয় আপতিত হয় তখন সে ধৈর্যধারণ করে, তখন তার জন্য তাও কল্যাণকর হয়ে ওঠে।[২]"

তাক্বদীর সম্পর্কে দুটি সম্প্রদায় পথভ্রষ্ট হয়েছে :

তন্মধ্যে একটি হলো জাবরিয়্যাহ সম্প্রদায়, এরা বলে, বান্দা তাক্বদীরের কারণে স্বীয় ক্রিয়া-কর্মে বাধ্য, এতে তার নিজস্ব কোনো ইচ্ছাশক্তি বা সামর্থ্য নেই।

আর দ্বিতীয়টি হলো ক্বাদারিয়্যাহ সম্প্রদায়, এদের বক্তব্য হলো, বান্দা তার যাবতীয় কর্মকাণ্ডে স্বীয় ইচ্ছা ও শক্তির ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পন্ন, তার কাজে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা বা কুদরতের কোনো প্রভাব নেই।

---

১ সূরা আল-হাদীদ (৫৭) : ২২-২৩
২ সহীহ মুসলিম

শরী'আত ও বাস্তবতার আলোকে প্রথম দল (জাবরিয়্যাহ সম্প্রদায়)-এর বক্তব্যের জবাব :

১. শরী'আতের আলোকে এর জবাব : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার জন্য ইরাদা ও ইচ্ছাশক্তি সাব্যস্ত করেছেন এবং বান্দার প্রতি তার কার্যক্রমের সম্বন্ধও আরোপ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْءَاخِرَةَ العمران ﴿١٥٢﴾

"তোমাদের কারও কাম্য হয় দুনিয়া আবার কারও কাম্য হয় আখেরাত।[১]"

আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظَّٰلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا الكهف ﴿٢٩﴾

"বলো, সত্য তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত। অতএব যার ইচ্ছা বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা কুফুরী করুক আমি যালিমদের জন্য অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি। যার বেষ্টনী তাদের পরিবেষ্টিত করে রাখবে।[২]"

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

مَّنْ عَمِلَ صَٰلِحًا فَلِنَفْسِهِۦ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾ فصلت ﴿٤٦﴾

"যে সৎকর্ম করে সে নিজের জন্যই করে আর যে অসৎকর্ম করে, তা তারই ওপর বর্তাবে। আপনার পালনকর্তা বান্দাদের প্রতি মোটেই যুলুম করেন না।[৩]"

---

১ সূরা আলে ইমরান (০৩) : ১৫২
২ সূরা আল-কাহাফ (১৮) : ২৯
৩ সূরা ফুসসিলাত (৪১) : ৪৬

২. বাস্তবতার আলোকে এর জবাব : সকল মানুষেরই জানা আছে যে, তার কিছু কর্ম স্বীয় ইচ্ছাধীন, যা তার আপন ইচ্ছায় সম্পাদিত করে। যেমন : খাওয়া-দাওয়া, পান করা এবং ক্রয়-বিক্রয় করা। আর কিছু কাজ তার অনিচ্ছাধীন। যেমন : অসুস্থতার কারণে শরীর কম্পন করা ও উঁচু স্থান থেকে নিচের দিকে পড়ে যাওয়া। প্রথম ধরনের কাজে মানুষ নিজেই কর্তা, নিজ ইচ্ছায় সে তা গ্রহণ করেছে এতে কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। আর দ্বিতীয় প্রকার কাজকর্মে তার কোনো নিজস্ব পছন্দ ছিল না এবং তার ওপর যা পতিত হয়েছে তার কোনো ইচ্ছাও তার ছিল না।

শরী'আত ও যুক্তির আলোকে দ্বিতীয় দল ক্বাদারিয়্যাহদের বক্তব্যের জবাব :

শরী'আত : আল্লাহ তা'আলা সকল বস্তুর স্রষ্টা, জগতের সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছায় অস্তিত্ব লাভ করে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র গ্রন্থে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, বান্দাদের সব কর্মকাণ্ডও আল্লাহর ইচ্ছায় বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنۢ بَعْدِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ وَلَٰكِنِ ٱخْتَلَفُوا۟ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُوا۟ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ البقرة ﴿٢٥٣﴾

"আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি এসে যাবার পর তাঁদের পয়গম্বরদের পরবর্তীরা পরস্পর লড়াই-বিগ্রহে লিপ্ত হতো না। কিন্তু তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেল। অতঃপর তাদের কেউ তো ঈমান এনেছে, আর কেউ হয়েছে কাফের। আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে তারা পরস্পর লড়াই করত না। কিন্তু আল্লাহ তা-ই করেন, যা তিনি ইচ্ছা করেন।[১]"

১ সূরা আল-বাকারা (০২) : ২৫৩

আল্লাহ আরও বলেন,

"আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতাম। কিন্তু আমার এ উক্তি অবধারিত সত্য, আমি জ্বীন ও মানব উভয় দ্বারা অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব।[১]"

যুক্তির মাধ্যমে এর জবাব : একথা নিশ্চিত যে, সমগ্র বিশ্বজগৎ আল্লাহর মালিকানাধীন এবং মানুষ এই বিশ্বজগতেরই একটি অংশ, তাই সেও আল্লাহর মালিকানাধীন। আর মালিকানাধীন কোনো সত্তার পক্ষে মালিকের অনুমতি ও ইচ্ছা ব্যতিরেকে তার রাজত্বে কোনো কিছু করা সম্ভব নয়।

---

১ সূরা আস-সাজদাহ (৪১) : ১৩

পরকাল বিষয়ক

'পরকাল' বিষয়ে আরজ আলী সাহেবের প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনার করার আগে একটি বিষয় বলা জরুরি মনে করছি। উনার প্রশ্নগুলোকে হুবহু উল্লেখ করে কলেবর বৃদ্ধি না করে এখন থেকে আমরা উনার প্রশ্নের মূল পয়েন্ট নিয়ে আগাব, ইনশাআল্লাহ। এই অধ্যায়ের শুরুতেই আরজ আলী মাতুব্বর প্রশ্ন করেছেন, 'জীব সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী?"

তিনি বলেছেন,

> **'মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য যদি হয় আল্লাহর নাম ও গুণকীর্তন করা, তাহলে জীব সৃষ্টির কারণ কী?'**

আরজ আলী সাহেব ঠিক বলেছেন। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ইবাদাত করা। আর অন্যান্য সবকিছুকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের জন্য। যেমন : কুরআন ঘোষণা দেয়,

"পৃথিবীর সবকিছু তিনি তোমাদের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।[১]"

---

১ সূরা আল বাকারা (০২) : ২৯

তাহলে মানুষ সৃষ্টির পাশাপাশি জীবজগৎ কেন সৃষ্টি করা হয়েছে তা কুরআন সুস্পষ্টরূপে জানিয়ে দিয়েছে। এক্ষেত্রে অভিযোগ তোলার আর কোনো দরকার আছে বলে মনে করি না। প্রশ্ন তোলার আগে আরজ আলী সাহেব কুরআনটাকে একটু নেড়েচেড়ে দেখলেই উত্তর পেয়ে যেতেন বলে মনে করি। এ ছাড়াও প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার জন্য জীবজগতের রয়েছে ব্যাপক অবদান। "খাদ্যশৃঙ্খল" নামের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জীবজগৎ থেকে উদ্ভিদজগৎ সবার রয়েছে কোনো না-কোনো অবদান। প্রকৃতির সকল জীবজগৎ এবং উদ্ভিদজগৎ কোনো না-কোনোভাবে একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং প্রকৃতিতে মানুষ এবং জীবজগতের টিকে থাকার জন্যও পরস্পরকে দরকার। এটা ভাবার কোনো উপায় নেই যে জীবজগতের সৃষ্টি নিরর্থক। আরজ আলী সাহেব এরপর প্রশ্ন করেছেন,

> **"পাপ-পুণ্যের ডায়েরি থাকতে হবে কেন? আল্লাহ যদি সর্বদর্শী ও সর্বশক্তিমান হন, তাহলে মানুষের পাপ-পুণ্য তিনি দেখলেই তো পারেন। ফেরেশতা দিয়ে সংরক্ষণ করার কী দরকার?"**

এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য আমরা একটা দৃশ্যের অবতারণা করতে পারি। ধরা যাক আরজ আলী সাহেবকে পরকালে তার হিসাব-নিকাশসহ ডাকা হলো। আরও ধরা যাক যে, ফেরেশতারা আমাদের পাপ-পুণ্যের হিসাব রাখে না। এমতাবস্থায়, আরজ আলী সাহেবকে ডেকে আল্লাহ যদি বলেন, আরজ আলী, তুমি ইহকালে এই পাপ করেছ, ওই পাপ করেছ। এ জন্য তোমার এই এই শাস্তি। আরজ আলী সাহেব যদি তখন বলে বসে, 'না তো! আমি তো এসব করিনি! আমি আবার এসব কবে করলাম? কোনো প্রমাণ আছে? প্রমাণ চাই।'

মানুষ যে পাপ-পুণ্য করে, ফেরেশতারা তা লিপিবদ্ধ করেন। এটা তাঁর একটা ডকুমেন্ট, একটা ভিডিওচিত্র, একটা প্রমাণ। আল্লাহ বলেছেন,

"অতএব কেউ অণু-পরিমাণ সৎ কাজ করলে তা সে (হাশরের ময়দানে) দেখবে এবং কেউ অণু-পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও সে (সেদিন) দেখবে।[১]"

---

১ সূরা যিলযাল (৯৯) : ০৭–০৮

সেদিন যখন আরজ আলী সাহেব তার কৃতকর্মের কথা অস্বীকার করতে চাইবে, তখন আল্লাহ এই ডকুমেন্টস, এই ভিডিওচিত্র প্লে করে বলবেন, "এই দ্যাখো তো। এসব কে করেছে?"

আরজ আলী সাহেবের তখন মনে পড়বে সব। তিনি বলবেন, 'তাই তো! তাই তো!' আরজ আলী সাহেবেরা যে অস্বীকার করবে, সেটা আল্লাহ তা'আলা জানেন। তাই তিনি ফেরেশতাদের মাধ্যমেও ডকুমেন্টস সংরক্ষণ করছেন যাতে এসব অবিশ্বাসীদের প্রশ্নের আর কোনো জায়গা না থাকে।

একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। আল্লাহও তো চাইলে এই ভিডিও বা ডকুমেন্টস সংরক্ষণ করতে পারতেন। তিনি কেন ফেরেশতাদের মাধ্যমে এটা সংরক্ষণ করতে গেলেন? বলে রাখা ভালো, এখানে একটি 'থ্রি স্টেপ ভেরিফিকেশান' পদ্ধতি আছে। যেমন, প্রথমে আল্লাহ নিজেই তাদের কৃতকর্মের বর্ণনা শোনাবেন। তারা যদি বলে, মানি না, তখন ফেরেশতাদের সংরক্ষণ করা রেকর্ড আনা হবে তাদের সামনে। এটা দেখেও যদি তারা সন্দেহে ভোগে, বিশ্বাস করতে না চায়, তখন আল্লাহ তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জবান খুলে দেবেন। তখন তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে। কুরআন বলছে,

> *"সেদিন আমি তাদের মুখে সিলমোহর লাগিয়ে দেবো। তাদের হাত আমার সঙ্গে কথা বলবে। আর তারা যা করত, সে সম্পর্কে তাদের পাগুলো সাক্ষ্য দেবে।[১]"*

এই থ্রি স্টেপ ভেরিফিকেশানের একটা মধ্যবর্তী স্টেপে ফেরেশতাদের কাজ আছে। এটার মানে কি এটাই বোঝায় যে আল্লাহ তা'আলা এসব সংরক্ষণ করতে অপারগ?

আরজ আলী সাহেব বলেছেন,

> **"পরকালের সুখ-দুঃখ কি শারীরিক না আধ্যাত্মিক? পরকালের শাস্তি-পুরস্কার সম্পর্কে যে বর্ণনাগুলো ধর্মীয় কিতাবাদি এবং ধর্মযাজকগণ বলে থাকেন, যেমন : শাস্তি হিসেবে পুঁজ, গরম পানি ইত্যাদি এবং পুরস্কার হিসেবে নানান কিছু**

১ সূরা ইয়াসীন (৩৬) : ৩৬

পাওয়ার কথা জানতে পারি, তাহলে ধরে নেওয়া যায় যে পরকালের সুখ-দুঃখ আধ্যাত্মিক নয়, শারীরিক। কিন্তু মানুষ মরার পরেই তো পচে-গলে মাটির সাথে মিশে যায়। এমতাবস্থায়, পচে-গলে মাটিতে মিশে যাওয়া মানুষকে তিনি কীভাবে শারীরিকভাবে শাস্তি দেবেন?"

মজার প্রশ্ন। আচ্ছা ধরুন, আপনার হাতে একটি স্মার্টফোন আছে। সেই স্মার্টফোন দিয়ে আপনার ফেইসবুকে লগ ইন করা আছে। ধরুন, আপনি মনের আনন্দে রিকশায় বসে ফেইসবুক চালাচ্ছেন। এমতাবস্থায় আপনার রিকশাটা গর্তে পড়ল আর আপনার ফোনটা হাত থেকে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

এখন আপনার ফোনটা তো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। এই ফোনে তো আপনার ফেইসবুক আইডি লগ ইন করা ছিল। এখন ফোন ভেঙে যাওয়ার সাথে সাথে কি আপনার শখের ফেইসবুক আইডিও নষ্ট হয়ে গেল? আপনার এতদিনের ভার্চুয়াল লাইফ, এত এত ফ্রেন্ড-ফলোয়ার, এ সবকিছু কি ফোন ভেঙে যাওয়ার সাথে সাথেই নষ্ট হয়ে গেল? নাহ। আপনি যখন বাসায় এসে আপনার ল্যাপটপে মেইল আর পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করবেন, দেখবেন আপনার সকল ভার্চুয়াল তথ্য আবার চলে এসেছে আপনার কাছে।

এই কাজটি যদি মার্ক জাকারবার্গ পারে, আল্লাহ পারবেন না কেন? মানুষের শরীরটাকে ফোনের সাথে তুলনা করুন। আর রূহটাকে তুলনা করুন ফেইসবুক আইডির সাথে। এখন আপনার দৈহিক শরীর নষ্ট হয়ে গেলেও, পরকালে যখন আপনার এই রূহটাকে আপনারই প্রতিকপিতে লগ ইন করানো হবে, তখন কি আপনার শরীরকে ফিরে পাওয়া যাবে না? কাজটা কি আল্লাহর জন্য খুব কঠিন?

নাহ, এটা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ। আল্লাহ বলেছেন,

"তিনি সৃষ্টির সূচনা করেন, পরে তিনিই আবার সৃষ্টি করবেন।[১]"

১ সূরা ইউনুস (১০) : ০৪

আরজ আলী সাহেব এবং তার অনুসারীদের আমরা এটা জানিয়ে রাখতে চাই যে, পরকালের সুখ-দুঃখ অবশ্যই শারীরের ওপর হবে। মানুষের শরীর মরার পরে পচে-গলে মাটির সাথে মিশে গেলেও সেখান থেকে পুনরায় সৃষ্টি করার ক্ষমতা আল্লাহ অবশ্যই রাখেন।

আরজ আলী সাহেব প্রশ্ন করেছেন এ রকম,

> **"ইহুদী, খ্রিস্টান ও মুসলমান জাতিরাই লাশ মাটিতে পুতিয়া রাখে, অন্যান্য জাতিরা ইহা করে না। তাহারা কেহ লাশ জলে ভাসাইয়া দেয়, কেহ মাঠে ফেলিয়া রাখে, কেহ পর্বতের চূড়ায় রাখিয়া দেয়, কেহ গাছের শাখায় ঝুলিয়া রাখে।"**

আরজ আলী সাহেব মৃতদেহ কবরস্থ করার প্রক্রিয়ার কথা এবং পরকালে শাস্তির কথা উল্লেখ করে বলেছেন, সবাই তো মৃতদেহ কবরস্থ করে না, বরং কেহবা আগুনে জ্বালাইয়া দেয়। এইভাবে যে সকল মানুষ পরজগতের যাত্রী হয়, তাহাদের গোরআজাব হয় কি না? যদি হয়, তবে কীরূপে? আর যদি না হয়, তবে লাশকে কবরে রাখিয়া লাভ কী?

গোটা ইসলামের কোথাও কিন্তু এই কথা বলা নেই যে পরকালের শাস্তি-পুরস্কার, জান্নাত-জাহান্নাম, বিচারকার্য ইত্যাদি সম্পন্ন করার জন্য মৃতদেহকে কবরস্থ করা আবশ্যক। কেউ যদি সাগরে ডুবে মারা যায় এবং তার লাশকে যদি সাগরের মাছেরা খুবলে খায়, তাহলে কি তার পরকালের বিচার হবে না?

আগেই বলেছি, পরকালের শাস্তি-পুরস্কার, আযাব ইত্যাদি মানুষের দুনিয়াবি শরীরের ওপর নির্ভর করে না। কারণ, কবরস্থ করার পরে ব্যক্তিমাত্রেরই লাশ পচে-গলে মাটিতে মিশে যায়। কিন্তু পরকালের হিসাব-নিকাশ কার্যাবলি সম্পন্নের জন্য যা দরকার তা হলো মানুষের আত্মা বা রূহের। মানুষ পানিতে ডুবে মারা যাক বা আগুনে পুড়ে, তার রূহের কোনোই ক্ষতি হয় না। সেই রূহটাই দরকার পরকালের হিসাব-নিকাশের জন্য। পরকালে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ক্ষমতাবলে সেই রূহটাতে আকৃতি দান করবেন। কাজটা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ।

সুতরাং একজন লোক কীভাবে মারা গেল বা তাকে কীভাবে কবরস্থ করা হলো সেটার ওপর পরকালের হিসাব-নিকাশ মোটেই নির্ভরশীল নয়। আরজ আলী সাহেবের এই ক্ষুদ্র জিনিসটি বোঝা উচিত ছিল বৈকি।

আরজ আলী সাহেব 'পরলোকের স্বরূপ কী' এবং 'স্বর্গ নরক কোথায়?' শিরোনামে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। এই শিরোনামের প্রশ্নে উনার মূল বক্তব্য এ রকম : মানুষ যেহেতু জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনেক এগিয়ে গেছে, পদার্থের অণু হতে পরমাণু পর্যন্ত ভেঙে এখন তার শক্তি পরীক্ষা করতে পারছে, সেহেতু পরকাল বা পরজগৎ যদি থেকেই থাকে, তাহলে বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিকগণ পরকালকে দেখতে পায় না কেন?

উনি আরও বলেছেন, পরকাল যদি থেকেই থাকে, তাহলে সেটা অবশ্যই যেকোনো এক সৌরজগতের অধীন। এখন পরকালের বর্ণনা থেকে যেহেতু জানা যায় যে কিয়ামতের ময়দানে সূর্যের প্রখর তাপে পাপীদের মস্তিস্ক বিগলিত হবে, তাহলে পরকালেও একটি বা একাধিক সূর্য থাকবে। যদি সূর্য থেকে থাকে, তাহলে সেই সূর্য কি ঘুরবে? সেখানেও কি দিনরাত্রি হবে?

আরজ আলী সাহেবের প্রতি যথাযথ সম্মান রেখেই বলতে হয়, মানুষ জ্ঞানের দিক থেকে কতটুকু এগিয়েছে ঠিক বলতে পারি না, তবে বিজ্ঞানের দিক থেকে যে খুব একটা মানুষ এগুতে পারেনি এখনো, বিজ্ঞান এখন সেটা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করে।

কোয়ান্টাম মেকানিক্স আবিস্কার হওয়ার পরে এই সত্য আরও সহজ হয়ে ফুটে উঠেছে। এতদিন মানুষ ভাবত, তারা মনে হয় মহাবিশ্বের সকল রহস্য জেনে বসে আছে। বিশাল মহাবিশ্বের আনাচে-কানাচে এমন কোনো জায়গা হয়তো নেই যেখানে বিজ্ঞানীদের টর্চ লাইটের আলো কিংবা হাবলের টেলিস্কোপ গিয়ে হানা দিয়ে আসেনি। প্রকৃতির এমন কোনো রহস্য হয়তো-বা নেই যেটার পেছনের রহস্য মানুষ উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়নি। এ রকম অবস্থায় বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানীদের নিয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে থাকা মানুষকে বিশাল একটি শোকের সংবাদ শোনাল আমেরিকাভিত্তিক বিজ্ঞানী সংস্থা 'নাসা'।

তারা জানাচ্ছে, এই সুবিশাল মহাবিশ্ব সম্পর্কে মানুষ আদতে খুব অল্পই জানতে পেরেছে। সমগ্র মহাবিশ্বের তুলনায় মানুষের জানার পরিমাণ অত্যন্ত ক্ষুদ্র। নাসা জানাচ্ছে, এই মহাবিশ্ব সম্পর্কে মানুষ এখন পর্যন্ত কেবল ৫ % জানতে পেরেছে। বাকি ৯৫ % সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানে না, কিছুই না।

আরজ আলী সাহেব যখন বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে হাবলের টেলিস্কোপ দিয়ে কোনো এক সৌরজগতে জান্নাত-জাহান্নামের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ খুঁজতে ব্যস্ত, তখন বিজ্ঞান আমাদের জানাচ্ছে যে, মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের জানার পরিধি নিতান্তই

সীমিত। তারা জানাচ্ছে, এত এত প্রযুক্তি, এত এত উন্নত বিজ্ঞান, কলা-কৌশল প্রয়োগ করেও আমরা এখন পর্যন্ত মাত্র ৫ % মহাবিশ্বকে জানতে পেরেছি। বাকি ৯৫ % সম্পর্কে আমরা নাকি কিছুই জানি না। আমাদের মহাবিশ্ব, আমাদের পৃথিবী, আমাদের চারপাশের জগৎ, পদার্থের অণু-পরমাণু ইত্যাদি সবকিছু মিলে মাত্র ৫ % । বাকি ৯৫ % তাহলে কী? এই বাকি ৯৫ % হলো অদৃশ্য বস্তু। আমাদের বিজ্ঞান এর নাম দিয়েছে 'ডার্ক ম্যাটার'। এই ডার্ক ম্যাটারের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা সম্প্রতিই জানতে পেরেছি, কিন্তু এখানে কী আছে, এখানে আসলে কী হয়, এটা কোন জগৎ, এটা যদি কোনো জগৎ হয়ে থাকে তাহলে সেই জগতের রহস্য কী তার কোনো কিছুই আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়।

এই ডার্ক ম্যাটার সম্পর্কে NASA বলছে, 'More is unknown than is known. No one expected this, no one knew how to explain it. But something was causing it. It is a complete mystery. But it is an important mystery'

অর্থাৎ সেই জগৎটা কেমন, সেখানে কী হয় তা নিয়ে আমাদের কোনো ধারণা নেই। পুরো মহাবিশ্ব সম্পর্কে মাত্র ৫ % জ্ঞান নিয়ে, বাকি ৯৫ % এর ডার্ক ম্যাটারের জগৎ নিয়ে আরজ আলী সাহেবেরা যদি 'জান্নাত—জাহান্নাম নাই। থাকলে দেখি না কেন' বলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে, তখন সত্যিকার অর্থেই হাসি পায়!

তা ছাড়া, আরজ আলী সাহেবেরা ধরেই নিয়েছেন যে, জান্নাত-জাহান্নাম, পরকাল বলে কিছু থেকে থাকলে প্রকৃতি তা আমাদের সামনে মেলে ধরবে, আর আমরা বিজ্ঞানের রঙিন চশমা চোখে লাগিয়ে তা দিব্যি দেখে ফেলতে পারব। কিন্তু বিজ্ঞান কি আমাদের প্রকৃতির সব রহস্য জানাতে পারবে? এর সোজাসাপ্টা উত্তর হচ্ছে—'না'। কোয়ান্টাম মেকানিক্স এসে বিজ্ঞানের এই ধ্রুব সত্যটা আমাদের সকলের কাছে পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে।

বাংলাদেশের একজন প্রথম সারির বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি, বিজ্ঞান-লেখক অধ্যাপক জাফর ইকবাল স্যার উনার কোয়ান্টাম মেকানিক্স বইয়ের শুরুতেই এই সত্যটা অকপটে স্বীকার করেছেন। তিনি তাঁর বইতে লিখেছেন,

'কাজেই যারা বিজ্ঞান চর্চা করে তারা ধরেই নিয়েছে আমরা যখন বিজ্ঞান দিয়ে পুরো প্রকৃতিটাকে বুঝে ফেলবো, তখন আমরা সবসময় সবকিছু সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবো। যদি কখনো দেখি কোনো একটা কিছু ব্যাখ্যা করতে পারছি না, তখন বুঝতে হবে এর পেছনের বিজ্ঞানটা তখনো জানা হয়নি। যখন জানা হবে তখন সেটা চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবো। এককথায়, বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা বা ভবিষ্যদ্বাণী সবসময়েই নিখুঁত এবং এবং সুনিশ্চিত। কোয়ান্টাম মেকানিক্স বিজ্ঞানের এই ধারণাটাকে পুরোপুরি পাল্টে দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করেছেন যে, প্রকৃতি আসলে কখনোই সবকিছু জানতে দেবে না। সে তার ভিতরের কিছু কিছু জিনিস মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে। মানুষ কখনোই সেটা জানতে পারবে না। সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপার হচ্ছে, এটা কিন্তু বিজ্ঞানের অক্ষমতা বা অসম্পূর্ণতা নয়। এটাই হচ্ছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানীরা একটা পর্যায়ে গিয়ে কখনোই আর জোর গলায় বলবেন না 'হবে', তারা মাথা নেড়ে বলবে— 'হতে পারে'।[১]

জাফর ইকবাল কোয়ান্টাম মেকানিক্সের দোহাই দিয়ে বলছেন, 'বিজ্ঞান দিয়ে কখনোই আমরা প্রকৃতির সকল রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারবো না। কিছু কিছু রহস্য আমাদের কাছে অধরাই থেকে যাবে।'

এই যখন বিজ্ঞানের হাল, তখন সেই বিজ্ঞানের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে বৈজ্ঞানিক ফিতা দিয়ে বাস্তব দুনিয়া রেখে 'পরাবাস্তব' দুনিয়ার জান্নাত–জাহান্নামের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাপতে নামাটা নিতান্তই নিম্নবুদ্ধির পরিচায়ক নয় কি? তা ছাড়া, বিজ্ঞান যে 'পরকাল' সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণাই দিচ্ছে না তাও কিন্তু নয়। সাইন্টিফিক ওয়ার্ল্ডে এখন 'Afterlife' নিয়ে ব্যাপক কাজ হচ্ছে।

অনেক বিজ্ঞানী এখন এই 'Afterlife' তথা 'পরকাল' নিয়ে গবেষণা করছেন। এক্ষেত্রে মেডিকেল সাইন্সে ব্যাপক জনপ্রিয়তা এবং পরিচিতি পাওয়া 'Near Death Experience' ফিল্ডের কথা উল্লেখ করা যায়। Near Death Experience কী? Near Death Experience হচ্ছে মৃত্যুর খুব কাছাকাছি গিয়ে সেখান থেকে যে অভিজ্ঞতা হয়, তার ওপর একটি পরীক্ষামূলক গবেষণা।

একসিডেন্ট, হার্ট অ্যাটাক বা অন্য কোনো কারণে যখন মানুষের হার্ট এবং ব্রেইন

---

১ কোয়ান্টাম মেকানিক্স, মু. জাফর ইকবাল, পৃষ্ঠা : ১০

উভয়ই নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, তখন মেডিকেলীয় ভাষায় সেটাকে 'ক্লিনিক্যালি ডেথ' বলা হয়। ডাক্তারগণ ঘোষণা করেন যে ব্যক্তিটা মৃত। 'ক্লিনিক্যালি ডেথ' ঘোষণা করার পরেও অনেক সময় কিছু কিছু লোক আল্লাহর ইচ্ছাতে প্রাণ ফিরে পায়। তারা বেঁচে ওঠে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জায়গায় এ রকম অহরহ ঘটনা ঘটে থাকে। ক্লিনিক্যালি ডেথ ঘোষিত হবার পরও মৃতব্যক্তির প্রাণ ফিরে পাওয়া।

এ রকম ক্লিনিক্যালি ডেথ অবস্থা থেকে বেঁচে আসা লোকদের নিয়ে কাজ করে 'Near Death Experience Research Foundation' । এই ফাউন্ডেশনের কাজ হলো বিশ্বের যে প্রান্তেই এ রকম 'ক্লিনিক্যাল ডেথ' মানুষের সন্ধান পাওয়া যাবে, সেখান থেকেই তথ্য সংগ্রহ করা।

এখন পর্যন্ত এই ফাউন্ডেশন প্রায় পাঁচ হাজার ক্লিনিক্যালি ডেথ মানুষের তথ্য সংগ্রহ করেছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে, প্রায় সবার এক্সপেরিয়েন্স এক্ষেত্রে একই রকম হয়।

ক্লিনিক্যালি ডেথ অবস্থা থেকে ফিরে আসা মানুষজন জানায়, তাদের হার্ট, ব্রেইন নিষ্ক্রিয় দেখে তাদের যখন ক্লিনিক্যালি ডেথ ঘোষণা করা হয়, তারপরও তারা তাদের চারপাশের সবকিছু দেখতে, শুনতে ও বুঝতে পারে। তারা বিচিত্র কিছু আলো দেখতে পায়। কারও কারও অভিজ্ঞতা এক গভীর নিকষ অন্ধকারের মধ্যে তাদের ছুটতে হচ্ছে, আবার কারও কারও অভিজ্ঞতা তারা ধবধবে সাদা, শুভ্র আলোর ঝলকানি দেখতে পায়। তারা জানায়, এই অবস্থায় তারা (মেইনলি তাদের আত্মা) বাধাহীনভাবে চলাফেরা করতে পারে। এমনকি তখন তাদের জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

এই পাঁচ হাজার লোকের এ রকম Near Death Experience কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিজ্ঞানী Jeffrey Long একটি বই লেখেন। বইটির নাম Evidence Of the Afterlife।

মৃত্যুপরবর্তী জীবন নিয়ে গবেষণা করছে এ রকম আরও অনেক বিজ্ঞানী আছে, যেমন : Dr. Marry Neal, Dr. Kevin Nelson, DR. Sam Parnia, DR. Jeffrey Long, Dr. Mario Beauregard, Dr. Peter Fenwick প্রমুখ।

আফসোস করতে হয়, বিজ্ঞানের ফিতা দিয়ে পরকালের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাপতে চাওয়া

আরজ আলী সাহেবেরা যদি আজকের দিনে বেঁচে থাকতেন, তাহলে হয়তো দেখতে পেতেন যে, পরকালও এখন বিজ্ঞানের গবেষণার অন্যতম বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে তারা বালুর মধ্যে মুখ গুঁজে পরকালকে অস্বীকার করত, সেই বিজ্ঞানই যে একসময় তাদের দিকে বুমেরাং হয়ে ফেরত আসবে তা যদি তারা জানত!

উনি জানতে চেয়েছেন কিয়ামতের মাঠের সূর্যটা আসলে কীরূপ হবে, সেটা কি ঘুরবে না স্থির থাকবে?

উনি যখন কিয়ামতের মাঠ অবধি 'ধরে' নিয়ে এগিয়েছেন, তাহলে তিনি 'স্রষ্টা' বলেও কেউ একজনকে আপাতত স্বীকার করেই এগিয়েছেন। এখন যেই স্রষ্টা এই সুবিশাল সুনিপুণ পরিচালনাধীন মহাবিশ্বকে ধ্বংস করতে সক্ষম, যিনি সূর্যকে তার নিজস্ব কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত করে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম, তিনি কি চাইলেই সেই সূর্যকে বা সূর্যের মতোই কোনো কিছুকে কিয়ামতের মাঠে পুনর্বার সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? তিনি অবশ্যই সক্ষম।

"তিনি যখন কোনো কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তিনি কেবল বলেন 'হও' আর তা হয়ে যায়।[১]"

উনি প্রশ্ন করেছেন, পরকালের বিষয়াদি, যেমন : কবরের সওয়াল-জওয়াব, মিযান, বিচারদিবস ইত্যাদি দুনিয়ার বিষয়বস্তুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কেন? যেমন : এখানে হাইকোর্টে অপরাধীর বিচার হয়, সওয়াল-জওয়াব হয়, তার বিচারকার্য সম্পাদিত হয়। পরকালের বিষয়গুলোও ঠিক এ রকম কেন? অভিনব কিছু নেই কেন?

পরকালের বিষয়গুলো দুনিয়াবি ব্যাপারাদির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এর কারণ হলো এই যে, দুনিয়ায় যখন আমাদের সামনে এসব ব্যাপার নিয়ে আলাপ করা হবে, তখন আমরা যেন সেগুলো খুব ভালোমতোই অনুধাবন করতে পারি। যদি জিনিসগুলো এমনই হতো যে আমরা সেসব সম্পর্কে কিছুই জানি না বা সেসব সম্পর্কে কোনো ধারণাই রাখি না, তাহলে আমরা পরকাল, জান্নাত–জাহান্নামকে কীভাবে অনুধাবন করব? যদি অনুধাবনই না করতে পারি, তাহলে সেই জগৎ সম্পর্কে আমরা বুঝব কীভাবে?

---

১ সুরা বাকারাহ (২) : ১১৭

আমরা যাতে খুব সহজেই বুঝতে পারি, অনুধাবন করতে পারি, সে মোতাবেক নিজেদের জীবন পরিচালনা করতে পারি, সে জন্যই তিনি সেগুলোকে এভাবে, আমাদের পরিচিত বিষয়াদির মতো করেই সাজিয়েছেন। আমরা যখন কোনো কিছু কাউকে বুঝাই, তখন আমরা সেই উদাহরণটাই টেনে আনি যেটা আমাদের কাছে সবচেয়ে পরিচিত, যেটা দিয়ে বোঝালে যাকে বোঝানো হচ্ছে সে খুব সহজেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। এতে করে কি এটা প্রমাণ হয় যে আমি যাকে বুঝাচ্ছি, তার কাছ থেকে আইডিয়া চুরি করেছি? নাহ। সে রকম কিছুই বোঝায় না। বরং এটা আমার জ্ঞান, কৌশল এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে। ঠিক সেভাবে আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'আলাও আমাদের এমন উপমা, এমন বর্ণনা দিয়ে বুঝিয়েছেন, যাতে করে আমরা সেগুলো খুব ভালো করে অনুধাবন করতে পারি। বুঝতে পারি।

ধর্ম সংক্রান্ত
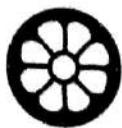
আরজ আলী সাহেবের বই থেকে আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, তিনি এমন-সব বিষয়কে ইসলামের সাথে 'ইসলাম' বলে জুড়ে দিয়েছেন, যা আদতে ইসলাম নয়। এটা এ জন্যই যে, ইসলাম সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিল অতি সামান্য। বিকৃত কিছু ধর্মচর্চাকে তিনি ইসলাম বলে চালিয়ে দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন।

তাঁর বইয়ের 'ধর্ম বিষয়ক' অধ্যায়ের শুরুতেই তিনি লিখেছেন,

> **"আল্লাহ মানুষকে পরিবর্তন না করিয়া হেদায়াতের ঝঞ্ঝাট পোহান কেন?"**

অর্থাৎ উনার কথা হলো, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যই যদি হয় আল্লাহর ইবাদাত করা, তাহলে সকল মানুষকে দিয়ে সেটা করিয়ে নিলেই তো পারে।

প্রথমত, আরজ আলী সাহেবকে বলতে চাই, আল্লাহর ইবাদাত করা মানুষ সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু ইবাদত শুধু কিছু রিচুয়াল বিষয়ের নাম নয়। "আল্লাহ যা ভালোবাসেন ও পছন্দ করেন এমন-সব প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য কথা ও কাজ সবই ইবাদত। তবে করতে হবে পরিপূর্ণ ভালোবাসা ও অমায়িক বিনয়ের মাধ্যমে।" [আল-উবুদিয়্যাহ] সুতরাং মানুষকে দিয়ে দুনিয়ার যত কাজ তিনি করাবেন সবগুলোতেই কোনো কোনো ইবাদত করানো উদ্দেশ্য।

এই জিনিসটা আমরা সূরা বাক্বারার শুরুতেই দেখতে পাই যেখানে আদম 'আলাইহিস সালামকে সৃষ্টির প্রাক্কালে আল্লাহর সাথে ফেরেশতাদের কথোপকথন হয়। যেমন : কুরআন বলছে,

"আর স্মরণ করো, যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি যমীনে একজন খলীফা (মানুষ) সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। তখন তারা (ফেরেশতারা) বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন যারা ঝগড়া-ফ্যাসাদ করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরাই তো আপনার প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তিনি (আল্লাহ) বললেন, 'নিশ্চই আমি যা জানি তা তোমরা জানো না'।[১]"

এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, আল্লাহ যখন ফেরেশতাদের সামনে ঘোষণা করলেন যে তিনি পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করবেন, তখন ফেরেশতারা বলল, আপনি কি এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যারা দুনিয়ায় ফ্যাসাদ করবে, ঝগড়া-বিবাদ করবে, রক্তপাত ঘটাবে? এর ঠিক পরেই তারা বলল, অথচ আমরাই তো আপনার প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

অর্থাৎ ফেরেশতাদের কথা হচ্ছে, আপনি যদি কেবল আপনার রিচ্যুয়াল বা প্রকাশ্য তাসবীহ ও তাক্বদীসের জন্যই মানুষ সৃষ্টি করে থাকেন, তাহলে আমরা তো আছিই। এই দেখুন, আমরাই তো আপনার প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

ফেরেশতারা ধরেই নিয়েছে যে, আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করছেন কেবল উক্ত প্রকার ইবাদাতের জন্য। অথচ আল্লাহ তাদের এই ধারণা উড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না'। যার অর্থ : আমার ইবাদত হবে তাদের মাধ্যমে। কারণ, তারা চিন্তা-চেতনা, মনন, ইচ্ছার মাধ্যমে আমার ইবাদত করবে তোমাদের মতো এক প্রকার ইবাদতে তারা ব্যস্ত থাকবে না।

আরজ আলীও ধারণা করে বসলেন যে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কেবলই আল্লাহর রিচ্যুয়াল ইবাদাত করা। অথচ মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কেবল এই এক ধরনের

---

১ সূরা বাক্বারা (০২) : ৩০

ইবাদত নয়। তিনি ফেরেশতাদের চেয়েও ভিন্ন আঙ্গিকে, ভিন্ন ফর্মুলায়, ভিন্ন মেকানিজমে মানুষকে তৈরি করেছেন। মানুষকে দিয়েছেন স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি। এই ইচ্ছাশক্তি ফেরেশতাদের কাছেও নেই। মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে তিনি তাদের সামনে হেদায়াতের পথ এবং গুমরাহীর পথ, দুটোই উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। এবং হেদায়াতের পথ ও গুমরাহীর পথ সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য তিনি অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। এখন মানুষ তাদের নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে হয় হেদায়াতের পথ বেছে নিয়েছে, নয়তো গুমরাহীতে নিমজ্জিত হয়েছে। এটাও মানুষ সৃষ্টির একটি উদ্দেশ্য। সুতরাং একথা সুস্পষ্ট যে, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কেবল আল্লাহর ইবাদাত করা নয়।

দ্বিতীয়ত বলতে চাই, ইসলাম বলে, মানুষকে দুনিয়াতে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে, কে আল্লাহর কথা শুনে চলে আর কে শোনে না তা পরিষ্কার করে দিতে চান। এ পরীক্ষার দাবিই হচ্ছে তিনি কিতাব দেবেন, রাসূল পাঠাবেন, বিবেক দেবেন এবং এগুলোকে যে কাজে লাগায় তার জন্য পুরস্কার দেবেন আর যে কাজে লাগায় না সে পুরস্কার পাবে না।

বস্তুত আরজ আলী সাহেবের কথা হচ্ছে আবদারী কথা। জানি না তিনি জীবনে কোনো পরীক্ষা দিয়ে সার্টিফিকেট নিয়েছেন কি না? যদি নিয়ে থাকেন তো মস্ত বড় অন্যায় করেছেন, তাঁর দরকার ছিল তার শিক্ষকের কাছে গিয়ে পিস্তল ধরে বলা আমাকে পরীক্ষা কেন দিতে হবে? আপনি আমাকে পাশ-ফেল একটা দিয়ে দেন না! অথবা তিনি জীবনে চাকরিতে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন কি না? তার তো উচিত সবার জন্য বিনা পরীক্ষা, সাক্ষাৎকার, প্রচেষ্টা ছাড়াই চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া। কী বলেন, তিনি তা করবেন? নাকি কোনো বিবেকবান মানুষ তা করবে?

‘*ভাগ্যলিপি কি অপরিবর্তনীয়?*’ শিরোনামে আরজ আলী সাহেব আবারও তাক্বদীর সম্পর্কে না জেনে উদ্ভট প্রশ্ন করে গেছেন। তিনি লিখেছেন,

‘মনে করা যাক, কোন এক ব্যক্তির ভাগ্যলিপিতে লেখা আছে যে সে নারকী। এখন সে নির্ধারিত ওই ফলোৎপাদক কার্য, যথা- চুরি, ডাকাতি, নরহত্যা ইত্যাদি করিবে না কি? যদি করে, তাহা সে কাহার ইচ্ছায় করে?’

আগের অধ্যায়ে আমি তাক্বদীর সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছি। আমি পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করেছি যে, তাক্বদীর পূর্বলিখিত এর মানে এটা নয় যে, মানুষ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন রোবট। আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন মানুষ তা-ই করছে। এটা হলে মানুষ আর জাগতিক অন্য বিবেকহীন বস্তুর মধ্যে তাহলে পার্থক্য কী?

আসল কথা হলো, আল্লাহ হলেন 'আলিমুল গায়েব। উনি ভবিষ্যদ্রষ্টা। উনি জানেন ভবিষ্যতে কে কী করবে, কী বলবে। তিনি সময় দ্বারা আবদ্ধ নন। তিনি সময়ের ঊর্ধ্বে। তিনি মানুষের অবস্থা জানেন বলেই সেগুলো লিখে রেখেছেন।

ধরুন, আমি যদি বলি, আজ থেকে ২০০ বছর পরে মুসলিমরা বিশ্ব শাসন করবে। এখন ২০০ বছর পরে গিয়ে যদি ঠিক ঠিক বিশ্ব মুসলিম-শাসনে চলে আসে, তাহলে তার মানে কি এটাই দাঁড়াবে যে, আমি বলেছি বলেই বিশ্ব মুসলিম-শাসনে চলে এসেছে? নাহ। বিশ্ব যদি মুসলিম-শাসনে আসে তাহলে তাদের চেষ্টা, তাদের তদবির, ঐকান্তিকতা দিয়েই আসবে। এখানে আমার কোনো হাত নেই। আমি জাস্ট অনুমান করেছি।

আমি মানুষ। আমি জানি না এক মিনিট পরে পৃথিবীতে কী হবে। আমি ভবিষ্যৎ বলতে পারি না। এ জন্যই আমাকে অনুমান করতে হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা হলেন 'আলিমুল গায়েব তথা ভবিষ্যদ্রষ্টা। তিনি সৃষ্টির শুরুতে বসেই দেখতে পান সৃষ্টির শেষে কী হতে পারে। সময় তাকে বন্দী করতে পারে না; বরং তিনিই সময়কে বন্দী করেন। আমাকে সৃষ্টি করার শুরুতেই তিনি জানেন আজ সোমবারে বসে আমি আমার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে ঠিক কোন কোন কাজ করব। তিনি জানেন বলেই লিখে রেখেছেন সেসব অগ্রিম। তার মানে কি এই যে, তিনি লিখে রেখেছেন বলেই আমরা এসব করছি? না; বরং এর মানে এটাই যে, আমরা এসব করব বলেই তিনি লিখে রেখেছেন। তাহলে কেউ চুরি, ডাকাতি, নরহত্যা করলে কার দোষ? স্রষ্টার? একদম না। এটা ব্যক্তিরই দোষ। স্রষ্টার নয়।

'আদমের পাপ কী?' শিরোনামে তিনি প্রশ্ন করেছেন,

> **'আদমকে বেহেস্তে রাখিয়া তাহাকে গন্দম খাইতে যে নিষেধ করা হইয়াছিলো, সে নিষেধ কি খোদা তা'আলার আন্তরিকতাপূর্ণ ছিলো? আদম গন্দম খাইয়া**

> **প্রকারান্তরে আল্লাহর ইচ্ছাই পূর্ণ করিলেন। যে কাজ ভাগ্যলিপির অনুকূল এবং আল্লাহর ইচ্ছাকে পূর্ণ করে, তাহাতে পাপ কী?'**

এই প্রশ্নের উত্তর একটু আগেই দেওয়া হয়েছে। আমরা স্পষ্ট করেছি যে, তাক্বদীর তথা ভাগ্যলিপিতে লিপিবদ্ধ থাকা মানেই তা আল্লাহর ইচ্ছা নয়। আদম 'আলাইহিস সালাম গন্দম ফল খেয়ে ভুল করেছিলেন। এই কাজ তিনি তাঁর স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করেই সম্পন্ন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু তাকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন সেহেতু তিনি তাকে সেটা করতে বাধা দেননি। কারণ, বাধা দিলে পরীক্ষার প্রশ্নই আসতে না। সুতরাং মানুষ ও জ্বীনজাতি যেহেতু বিবেকবান ও ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন সত্তা, শুধু তাদেরকেই তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা যেভাবে আমাদের পাপকাজ না করার জন্য গাইডলাইন দেন, সে রকম আদম 'আলাইহিস সালামকেও নিষেধ করেছিলেন কেবল। আদম 'আলাইহিস সালাম তা পালনে ব্যর্থ হলেন বলে তিনি বেহেশত থেকে বিচ্যুত হন। ব্যস! মূলত তাক্বদীর সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে মানুষ এ ধরনের প্রশ্নগুলো করে থাকে। আরজ আলীও ঠিক তা-ই করেছেন।

'শয়তান কী' শিরোনামে আরজ আলী সাহেব বলেছেন,

> **'ধর্মধ্যায়ীগণ বলিয়া থাকেন যে, শয়তান পূর্বে ছিল 'মকরম' বা 'ইবলিশ' নামক বেহেস্তবাসী একজন প্রথম শ্রেণীর ফেরেশতা এবং অতিরিক্ত মুসল্লি।'**

আরজ আলী সাহেব এখানে জঘন্য একটি মিথ্যাচার করেছেন। সেটি হলো, ইবলিশ কখনোই ফেরেশতা ছিল না। সে ছিল একজন জ্বীন। পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতে সুস্পষ্ট বলা আছে যে, ইবলিশ একজন জ্বীন। যেমন : আল্লাহ তা'আলা বলছেন,

'স্মরণ করুন, যখন আপনার রব ফেরেশতাদের বললেন, 'আদমকে সিজদাহ করো', তখন তাদের সকলে আদমকে সিজদাহ করল শুধু ইবলিশ ছাড়া। সে ছিল জ্বীনদের অন্তর্ভুক্ত।[১]'

---

১ সূরা আল কাহাফের ৫০ নম্বর আয়াতে

এখানে স্পষ্ট বলা হচ্ছে, ইবলিশ ছিল জ্বীনদের অন্তর্ভুক্ত। আমরা আরেক জায়গার কথোপকথন খেয়াল করি।

আল্লাহ তা'আলা যখন ফেরেশতাদের হুকুম করলেন আদম 'আলাইহিস সালামকে সিজদাহ করার জন্য, তখন সবাই সিজদাহ করলেও ইবলিশ করেনি। সে গর্বভরে বলেছিল,

'আমি তাঁর (আদমের) চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি থেকে।[১]'

এখানে স্পষ্ট যে, ইবলিশ তার গাঠনিক উপাদান জানিয়ে বলছে আল্লাহ তাকে তৈরি করেছেন আগুন থেকে। যদি সে ফেরেশতা হতো, তাহলে নিশ্চয়ই সে তার গাঠনিক উপাদান হিসেবে আগুনের বদলে 'নূর' তথা আলোর কথাই বলত। কারণ, একথা আমরা সকলে জানি যে, ফেরেশতারা নূরের তৈরি। কিন্তু ইবলিশ নিজেকে নূরের তৈরি দাবি না করে আগুনের তৈরি দাবি করেছে। এখন কারা আগুন থেকে তৈরি? কুরআন বলছে,

'এবং জ্বীনজাতিকে আমি আগুনের লেলিহান শিখা থেকে সৃষ্টি করেছি।[২]'

তাহলে কুরআনের কোথাও দাবি করা হয়নি যে ইবলিশ ফেরেশতা ছিল; বরং ইবলিশ নিজেই বলেছে সে আগুনের তৈরি। আর একমাত্র আগুন থেকে সৃষ্ট হলো জ্বীনেরাই। সুতরাং একথা তাহলে স্পষ্ট যে, ইবলিশ ফেরেশতা নয়, জ্বীন ছিল।

প্রশ্ন আসতে পারে, তাহলে আল্লাহ তো সেদিন ফেরেশতাদেরই নির্দেশ দিয়েছিলেন আদম 'আলাইহিস সালামকে সিজদাহ করার জন্য। জ্বীনদের তো দেননি। তাহলে জ্বীন হয়ে ইবলিশ কেন সিজদাহ করতে যাবে?

মূলত, আরবী ব্যাকরণে একটি নিয়ম আছে। এই নিয়মটিকে বলা হয় Tagleeb । এটার অর্থ : যখন ম্যাজরিটিকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হবে, তখন সেখানে

১ সূরা আল আ'রাফ (০৭) : ১২
২ সূরা আল হিজর (১৫) : ২৭

মাইনোরিটিও ইনক্লুড হয়ে যাবে। যেমন : কোনো ক্লাসে যদি দশ জন ছেলে এবং এক জন মেয়ে থাকে, তাহলে ক্লাসটিচার যদি ম্যাজরিটি দশ জনকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলেন, তাহলে মাইনোরিটি একজনও সেখানে ইনক্লুড হয়ে যাবে।

ঠিক সেভাবেই, সেদিন সংখ্যাগরিষ্ঠ ফেরেশতাদের ভিড়ে সংখ্যালঘু ছিল ইবলিশ। ফেরেশতাদের জন্য দেওয়া নির্দেশ সমানভাবে তার ওপরও বর্তায়। এতে করে কোনোভাবেই এটা বোঝায় না যে, ইবলিশ ফেরেশতা ছিল। কুরআনুল কারীমে স্পষ্ট ইবলিশকে জ্বীন বলে উল্লেখ করা সত্ত্বেও আরজ আলী সাহেবেরা কীভাবে তাকে ফেরেশতা বলে চালিয়ে দেয়? এটা কি নিছক ইসলাম আর কুরআন নিয়ে অজ্ঞতার ফল, নাকি অন্য কিছু?

এরপর ফেরেশতাদের সাথে গুলিয়ে আরজ আলী সাহেব বলেছেন,

> **"ফেরেশতাদের যেহেতু লিঙ্গাভেদ থাকে না, তাহলে ইবলিশ কীভাবে বংশবৃদ্ধি করে? বংশবৃদ্ধি করতে হলে তো তার ক্লীবত্ব ত্যাগ করে তাকে পুংলিঙ্গের অধিকারী হতে হবে এবং তার একজন স্ত্রী-শয়তানেরও দরকার বংশবৃদ্ধি করার জন্য।"**

যেহেতু ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি যে, ইবলিশ ফেরেশতা নয়, জ্বীন ছিল, সেহেতু জ্বীনদের যে বংশবৃদ্ধি হয়, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা থাকতে পারে, তা প্রমাণিত। সেহেতু আরজ আলী সাহেবের মিথ্যা প্রোপাগান্ডা অনুযায়ী ইবলিশকে নতুন করে তার ক্লীবত্ব ত্যাগ করে পুংলিঙ্গ গ্রহণ করতে হচ্ছে না।

শয়তান আছে কি নেই আরজ আলী সাহেব তার প্রমাণ চেয়েছেন। আরজ আলী সাহেবদের একটি মারাত্মক সমস্যা এই যে, উনারা সবকিছুতে বিজ্ঞানের বাটখারা বসিয়ে তাকে মাপতে চান। অথচ তারা চিন্তাও করে না যে, তাদের বিজ্ঞানের কত কত সীমাবদ্ধতা আছে।

ইবলিশ জ্বীন ছিল। জ্বীনেরা আগুনের তৈরি। তারা ভিন্ন জগতের, ভিন্নমাত্রার কোনো সৃষ্টি কি হতে পারে না? অবশ্যই পারে। আদম 'আলাইহিস সালামকে সৃষ্টির প্রাক্কালে ফেরেশতাদের সাথে সেদিনের সেই মজলিশে ইবলিশের উপস্থিতিই প্রমাণ করে, তারা ভিন্ন একটি জগতের, ভিন্ন একটি মাত্রার।

তবে তারা আমাদের আশেপাশেই বিচরণ করে আমরা তাদের দেখি না, তারা আমাদের দেখে।[১]

আরজ আলী সাহেবদের বিজ্ঞান হন্যে হয়ে গ্রহ থেকে গ্রহ চযে বেড়াচ্ছে এলিয়েনের খোঁজে। ভিন্ন জগতের ভিন্ন মাত্রার ভিন্ন সৃষ্টি এই এলিয়েনের ওপর ঈমান আনা যায়, কিন্তু সমস্যা হয়ে যায় যখন ইসলাম জ্বীনের কথা বলে। সেলুকাস!

আরজ আলী সাহেব প্রশ্ন করেছেন,

> **"সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা আল্লাহর উপাসনা বা ইবাদাতের সময় নির্দিষ্ট কেন বা এসবের জন্য নির্দিষ্ট দিক নির্ণয় কেন?"**

আরজ আলী সাহেবরা তাঁদের নিজস্ব চিন্তাধারা নিয়ে এতই বিভোর, এতই আত্মনিমগ্ন থাকেন যে একটা নির্দিষ্ট জিনিসের, সেটা ধর্ম হোক আর যা-ই হোক, কিছু রুলস এন্ড রেগুলেশন্স থাকে বা থাকতে হয়, সেটা তাঁরা বেমালুম ভুলে বসে আছেন।

সেক্যুলার পৃথিবীর দিকে তাকালেই তো সেটা আমরা বুঝতে পারি। একটা স্কুলে নির্দিষ্ট একটা সময়ে 'জাতীয় সংগীত' গাওয়ানো হয়। একটা দেশের প্রতিটা সামরিক বাহিনীতেই সব কাজই নির্দিষ্ট সময় মোতাবেক করা হয়। এগুলো হলো 'রুলস এন্ড রেগুলেশনস'।

একটি স্কুলের কথা চিন্তা করা যাক। ধরুন আপনার বাচ্চা ক্লাস টু-তে পড়ে। আপনি তার স্কুল হতে দেওয়া প্রসপেক্টাস কিংবা সিলেবাস খুললেই দেখবেন সেখানে লেখা থাকে, সপ্তাহের অমুক দিন থেকে অমুক দিন স্কুল এতটা থেকে এতটা পর্যন্ত খোলা থাকে। অমুক অমুক দিন স্কুল বন্ধ থাকে। আপনি যখন আপনার বাচ্চাকে স্কুলে পাঠান, আপনি কিন্তু সেই সময় অনুযায়ী স্কুলে পাঠান যে সময়টা স্কুল কর্তৃপক্ষ আপনাকে নির্ধারণ করে দিয়েছে। এই নির্দিষ্ট সময়ের পরে স্কুলে আসলে আপনার বাচ্চাকে ক্লাসে এলাউ করা হয় না। কিংবা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে যদি আপনার সন্তান স্কুলে এসে হাজির হয়, তার জন্য টিচাররা ক্লাস শুরু করে দেয় না। প্রত্যেকটা জিনিস সিস্টেম্যাটিক।

---

১ সূরা আল-আ'রাফ (০৭) : ২৭

ইসলাম শুধু একটি ধর্ম নয়। একটি একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান। কুরআন এবং হাদীস হচ্ছে এই জীবনবিধানের একটি ম্যানুয়াল। সুতরাং এই জীবনবিধানের রিচুয়ালের একটি নির্দিষ্ট সময় থাকবে না, সিস্টেম্যাটিক হবে না, তা কী করে হয়? আর মুসলিম শব্দের অর্থ হচ্ছে 'আত্মসমর্পণকারী'। একজন মুসলিম তার রবের কাছে আত্মসমর্পণ করে চলে। তার কোনো ইচ্ছা যদি তার রবের বিধানের বিপরীতে যায়, সে তার ইচ্ছের বদলে তার রবের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়। এটাতেই সে কল্যাণ খুঁজে পায়। তাই মহান রাব্বুল আ'লামীন আদেশ করেছেন আমরা যেন পবিত্র ক্বাবার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করি। এটা আল্লাহর আদেশ। এখন, এই আদেশ দিয়ে তিনি দেখতে চান যে কারা এই আদেশ অনুসরণ করে।

আরজ আলী সাহেবদের মতো অনেকেই বলে, ক্বাবা তাওয়াফ করে, ক্বাবার দিকে মুখ করে নামাজ পড়ে মুসলিমরা নাকি মূলত ক্বাবার পূজা করে! এটা যে কত বড় মিথ্যাচার, তাদের ভুল ধারণা তা একটি হাদীস থেকেই আমরা বুঝতে পারি। সেটি হলো, ক্বাবা শরীফে থাকা হাজরে আসওয়াদে চুমু খেয়ে একবার ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেছিলেন, 'আল্লাহর কসম! তুমি তো কেবল একটি পাথর ছাড়া আর কিছুই নও। আমি তোমাকে কোনো দিনও চুমু খেতাম না যদি না আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতাম তোমাকে চুমু খেতে।'

এই হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি, হাজরে আসওয়াদে চুমু খাওয়া একটা সুন্নাতের অনুসরণমাত্র। এবং এই জিনিসটা একটা পাথর। এটার কোনো বিশেষত্ব নেই। শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাতে চুমু খেয়েছিলেন বলেই ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুও চুমু খেয়েছিলেন। এটা আনুগত্যের একটা অংশ, আর কিছু না। তা ছাড়া, ইসলাম যদি নির্দেশ দিত যে, যার যেদিকে ফিরে নামাজ পড়তে মন চায়, সে সেদিকে ফিরে নামাজ পড়তে পারে, তাহলে বিরাট এক সমস্যার জন্ম নিত। কী রকম সেটা?

ধরুন, একই কাতারে আপনি পশ্চিমমুখী, আমি উত্তরমুখী। আমার পাশের জন দক্ষিণমুখী এবং এর পরের জন পূর্বমুখী। জিনিসটা কেমন দেখায়? বিদঘুটে না? নির্দিষ্ট দিকে ক্বিবলা নির্ধারণ করে দেওয়ার এটাও একটা কারণ হতে পারে।

একই পৃষ্ঠায় আরজ আলী সাহেব *'ফেরেশতাদের কাজ কী'* শিরোনামে প্রশ্ন করেছেন।

ইসলাম শুধু একটি ধর্ম নয়। একটি একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান। কুরআন এবং হাদীস হচ্ছে এই জীবনবিধানের একটি ম্যানুয়াল। সুতরাং এই জীবনবিধানের রিচুয়ালের একটি নির্দিষ্ট সময় থাকবে না, সিস্টেম্যাটিক হবে না, তা কী করে হয়? আর মুসলিম শব্দের অর্থ হচ্ছে 'আত্মসমর্পণকারী'। একজন মুসলিম তার রবের কাছে আত্মসমর্পণ করে চলে। তার কোনো ইচ্ছা যদি তার রবের বিধানের বিপরীতে যায়, সে তার ইচ্ছের বদলে তার রবের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়। এটাতেই সে কল্যাণ খুঁজে পায়। তাই মহান রাব্বুল আ'লামীন আদেশ করেছেন আমরা যেন পবিত্র ক্বাবার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করি। এটা আল্লাহর আদেশ। এখন, এই আদেশ দিয়ে তিনি দেখতে চান যে কারা এই আদেশ অনুসরণ করে।

আরজ আলী সাহেবদের মতো অনেকেই বলে, ক্বাবা তাওয়াফ করে, ক্বাবার দিকে মুখ করে নামাজ পড়ে মুসলিমরা নাকি মূলত ক্বাবার পূজা করে! এটা যে কত বড় মিথ্যাচার, তাদের ভুল ধারণা তা একটি হাদীস থেকেই আমরা বুঝতে পারি। সেটি হলো, ক্বাবা শরীফে থাকা হাজরে আসওয়াদে চুমু খেয়ে একবার ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেছিলেন, 'আল্লাহর কসম! তুমি তো কেবল একটি পাথর ছাড়া আর কিছুই নও। আমি তোমাকে কোনো দিনও চুমু খেতাম না যদি না আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতাম তোমাকে চুমু খেতে।'

এই হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি, হাজরে আসওয়াদে চুমু খাওয়া একটা সুন্নাতের অনুসরণমাত্র। এবং এই জিনিসটা একটা পাথর। এটার কোনো বিশেষত্ব নেই। শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাতে চুমু খেয়েছিলেন বলেই ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুও চুমু খেয়েছিলেন। এটা আনুগত্যের একটা অংশ, আর কিছু না। তা ছাড়া, ইসলাম যদি নির্দেশ দিত যে, যার যেদিকে ফিরে নামাজ পড়তে মন চায়, সে সেদিকে ফিরে নামাজ পড়তে পারে, তাহলে বিরাট এক সমস্যার জন্ম নিত। কী রকম সেটা?

ধরুন, একই কাতারে আপনি পশ্চিমমুখী, আমি উত্তরমুখী। আমার পাশের জন দক্ষিণমুখী এবং এর পরের জন পূর্বমুখী। জিনিসটা কেমন দেখায়? বিদঘুটে না? নির্দিষ্ট দিকে ক্বিবলা নির্ধারণ করে দেওয়ার এটাও একটা কারণ হতে পারে।

একই পৃষ্ঠায় আরজ আলী সাহেব *'ফেরেশতাদের কাজ কী'* শিরোনামে প্রশ্ন করেছেন।

ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, আল্লাহ ফেরেশতাদের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করান, এর অর্থ এটা নয় যে তিনি এই কাজগুলো করতে অক্ষম। বরং তিনি তার অনুগত একটি সৃষ্টিকে দিয়ে কাজগুলো করান। এটা আল্লাহর ক্ষমতাকে আরও বিশালরূপে প্রকাশ করে।

'দূরত্বহীন যাতায়াত কি সম্ভব?' শিরোনামে আরজ আলী সাহেব লিখেছেন, "শোনা যায় জিব্রাঈল আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী নিয়ে আসতেন এবং ওহী দিয়ে চলে যেতেন।"

এতটুকু বলে তিনি একটি সিদ্ধান্ত দিয়ে বসেছেন। বলেছেন, "আল্লাহ নিশ্চয়ই নবীদের হতে দূরে ছিলেন না। যদি দূরেই না থাকেন, তাহলে জিব্রাঈল কোত্থেকে আসতেন আর কোথায় ফিরে যেতেন?"

আরজ আলী সাহেবদের ধর্মের ব্যাপারে, বিশেষ করে ইসলামধর্মের ব্যাপারে অজ্ঞতাই মূলত এ রকম প্রশ্ন উত্থাপনের মূল কারণ। আমরা আগের অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করেছি যে, আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর আরশে রয়েছেন।

তিনি আরশ থেকেই ফেরেশতা জিব্রাঈল 'আলাইহিস সালাম এর মাধ্যমে নবীদের কাছে ওহী পাঠাতেন। আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'আলা হচ্ছেন এই সমগ্র সৃষ্টিজগতের মালিক। একচ্ছত্র অধিপতি। রাজাধিরাজ।

আমরা সামান্য একটি গরিব দেশের প্রধানমন্ত্রী অথবা রাষ্ট্রপতির কথা চিন্তা করি। তারা যখন কারও কাছে কোনো বার্তা পাঠান, তখন কি প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি নিজে এসে তা ব্যক্তির হাতে তুলে দিয়ে যান? না। না, তারা সেটা তাদের পারসোনাল সেক্রেটারি বা অন্য কারও মাধ্যমে ব্যক্তি বরাবর পৌঁছান।

এতে করে কি প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির সম্মান ক্ষুণ্ণ হয় না বৃদ্ধি পায়? এই যদি হয় একজন অতি সামান্য প্রধানমন্ত্রীর সম্মানের নমুনার স্বাক্ষর, তাহলে যিনি বিশ্বজাহানের রব, যিনি এই সমস্ত সৃষ্টিকুলের সৃষ্টিকর্তা, তিনি কি তার বান্দার কাছে কোনো বাণী পাঠাতে হলে আসমান থেকে নেমে আসবেন? প্রশ্নটাই কি হাস্যকর না?

এরপরে তিনি প্রশ্ন করেছেন *মি'রাজ সত্য না স্বপ্ন?*

প্রশ্নের শুরুতেই তিনি বলেছেন,

> **"কথিত হয় যে, মে'রাজ গমনে (স) এর বাহন ছিলো প্রথম পর্বে 'বোরাক' ও দ্বিতীয় পর্বে 'রফরফ'। উহারা এরূপ দুইটি জানোয়ার, যাহার দ্বিতীয়টি জগতে নাই। বোরাক- পশু, পাখি ও মানব এই তিন জাতির প্রাণীর মিশ্ররূপের জানোয়ার। অর্থাৎ তাহার ঘোড়ার দেহ, পাখির মতো পাখা, এবং রমণীসদৃশ মুখমণ্ডল।"**

আরজ আলী সাহেব বোরাকের এ রকম অদ্ভুত বর্ণনা কোথায় পেয়েছেন তা তিনি উল্লেখ করেননি। হাদীস শরীফে বোরাকের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা হলো, এটা আকৃতিতে খচ্চরের চেয়ে ছোট এবং গাধার চেয়ে বড়। কিন্তু আরজ আলী সাহেব এই বাহনের গায়ে পাখির মতো ডানা এবং রমণীর মুখ কোথায় পেলেন তা আমরা জানি না।

আরজ আলী সাহেব বলেছেন, আলোর চেয়ে বেশি গতিশীল কোনো কিছু জগতে নেই। তিনি আরও বলেছেন, বিজ্ঞানীগণ মহাশূন্য চষে বেড়িয়েও কোথাও বেহেশত, দোযখ, আরশের খোঁজ পায় নাই। যেহেতু বিজ্ঞানীরা তাদের দৃশ্যমান মহাবিশ্বে এসবের কোনো অস্তিত্ব পায় নাই, তাহলে এগুলো কোথায়? এগুলো কি আদৌ আছে? থাকলেও হয়তো-বা মহাবিশ্বের বহির্ভাগে আছে। কিন্তু কথা হলো, সামান্য জন্তুর পিঠে চড়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে এই কোটি কোটি মাইল দূরত্বের আরশভ্রমণে গেলেন?

ইসলাম নিয়ে যার ন্যূনতম পড়াশুনা আছে, সে রকম ব্যক্তিমাত্রই আরজ আলী সাহেবের এই শিশুসুলভ প্রশ্ন শুনে হেসে উঠবে। আরজ আলী সাহেবদের সমস্যা হলো, তারা তাদের বস্তুবাদী চোখ দিয়ে দ্বীনে ইসলামকে যাচাই করে। ফলে তারা মনে করে, তারা যা কিছু দেখতে পায় কেবল জগতে সেসবই অস্তিত্বশীল। যা তারা চোখে দেখে না, তার কোনো কিছুরই জগতে অস্তিত্ব নেই।

বস্তুবাদ তথা আরজ আলী সাহেবদের এই পুরোনো ধ্যান-ধারণা থেকে বিজ্ঞান নিজেই এখন ইউটার্ন দিয়ে সরে এসেছে। বিজ্ঞান এখন খুব জোরেশোরেই বিশ্বাস করে যে, তাদের জানার আর বোঝার জগৎ এতটাই ক্ষুদ্র যে, বিশাল মহাবিশ্বের

সাথে তুলনা করলে বলতে হয়, তারা আসলে মহাবিশ্ব সম্পর্কে কিছুই জানে না।

অনেক বিজ্ঞানী এখন বিশ্বাস করে যে, আমরা মূলত Computer Matrix একটা বিশ্বে আছি। আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছে অন্য কোনো গ্রহের অন্য কোনো বুদ্ধিমান সত্তা যে আমাদের চেয়েও বুদ্ধিমান। কেউ কেউ মনে করে, আমরা মূলত ভবিষ্যতেই আছি। আবার কেউ কেউ দাবি করে, আমরা সবাই একটা ঘোরের মধ্যে আছি। ঘোর কাটলে দেখা যাবে, এসবের কোনো কিছুই আদতে অস্তিত্বশীল নয়।

যাহোক, এসব হলো বিভিন্ন থিওরি, মত ইত্যাদি। বিজ্ঞান বিজ্ঞানের মতো করেই আগাচ্ছে। বিজ্ঞান এমন এক জিনিস, যার ওপর নির্ভর করে কখনোই কোনো ফাইনাল ডিসিশান নেওয়া যায় না। বিজ্ঞান সর্বদাই পরিবর্তনশীল।

আরজ আলী সাহেবদের সমস্যা হলো, তারা বিজ্ঞানের সাথে ধর্মকে গুলিয়ে জগাখিচুড়ি বানিয়ে ফেলেছেন। তারা ধরে নিয়েছেন, বিজ্ঞান দিয়ে ধর্মের পোস্টমর্টেম করে ধর্মকে বাতিল করে দেওয়া সম্ভব। আদতে, বিজ্ঞান এবং ধর্ম দুইটা দুই বিষয়।

ধর্ম কখনোই বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় নয়। আবার বিজ্ঞান কখনোই ধর্মের মাথাব্যথাও নয়। কিন্তু বাই ন্যাচার, এই দুটো পরস্পরের প্রতিযোগীও নয়। এ জন্যই বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছিলেন,

"ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান অন্ধ এবং বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম পঙ্গু।"

আরজ আলী সাহেব ধরেই নিয়েছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বোরাকে চড়েই মনে হয় সাত আসমান ভ্রমণ করেছেন। কিন্তু আদতে তা নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বোরাকে চড়ে কেবল বায়তুল হারাম থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত গিয়েছিলেন। আর বায়তুল হারাম এবং বায়তুল মুকাদ্দাস দুটোই এই পৃথিবীতে। পৃথিবীর বাইরে নয়। সুতরাং বোরাকে চড়ে সাত আসমান ভ্রমণটা নিশ্চিতরূপে বানোয়াট, মিথ্যা এবং অজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। তা ছাড়া, বোরাকের একটা আকৃতি হাদীস শরীফে পাওয়া যায়। এটা আকৃতিতে খচ্চরের চেয়ে ছোট এবং গাধার চেয়ে বড়।

এই বর্ণনা থেকে আরজ আলী সাহেবেরা ধরে নিয়েছেন যে, এটা মনে হয় কোনো প্রাণীসদৃশ যেটা নিশ্বাস নেয়, ঘাস খায়, মল ত্যাগ করে ইত্যাদি। কিন্তু হাদীসের কোনো রেওয়ায়েতে এ রকম কিছুই পাওয়া যায় না। ব্যাপারটাকে বোঝার জন্য চলুন আমরা একটা কাল্পনিক ঘটনার অবতারণা করি।

ধরুন, আপনার মাকে আপনি বিমানযোগে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় নিয়ে এলেন। আরও ধরুন, আজকের আগে আপনার মা কোনো দিনও বিমান চোখে দেখেননি। এখন আপনার মা যখন ঢাকায় এসে উনার প্রতিবেশীদের সাথে বিমানভ্রমণের গল্প করবেন, তখন নিশ্চয়ই প্রতিবেশীরা উনার কাছে বিমান সম্পর্কে জানতে চাইবে। এখন প্রতিবেশীরা ইতিপূর্বে কোনো দিন বিমান স্বচক্ষে না দেখার কারণে আপনার মা যদি বলেন, 'বিমানটা হচ্ছে দেখতে পাখির মতো। এটা হাতির চেয়ে ছোট কিন্তু গরুর চেয়ে বড়।'

বলুন তো, আপনার মায়ের বর্ণনায় কি কোনো ভুল আছে? আমাদের দেখা বিমানগুলো কিন্তু পাখির আকৃতিতেই তৈরি। এগুলোর ডানাও আছে। এখন আপনার মা কেন হাতি আর গরুর উপমা টেনে বিমানের আকৃতি বোঝালেন? কারণ হচ্ছে, এর আগে আপনার মায়ের প্রতিবেশীরা বিশালকার জন্তু বলতে গরু আর হাতিকেই দেখেছে। এর বাইরে আর কিছু দেখেনি। যখন দেখেছে বিমানের আকৃতিটাও অনেকটাই জন্তুর মতো, তাই উপমাপ্রদানের ক্ষেত্রেও হাতি আর গরুর কথাই তিনি বর্ণনা করেছেন তাদের বোঝাবার স্বার্থে। এখন বিমানের আকৃতি বোঝাতে আপনার মা যেহেতু গরু আর হাতির উপমা দিয়েছেন, এর মানে কি এটাই বুঝায় যে বিমান গরু আর হাতির মতো কোনো জন্তু? গরু আর হাতির মতো বিমানও খায়? নিশ্বাস নেয়? মল ত্যাগ করে?

আপনার মায়ের বক্তব্য নিশ্চয় এটা বোঝায় না। ঠিক সেভাবে, বোরাক সম্পর্কে দেওয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বক্তব্যও এটা বোঝায় না যে বোরাক পৃথিবীর কোনো জন্তু। বোরাকের যে আকৃতি ছিল, সে রকম আকৃতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের লোকেরা কেবল গাধা আর খচ্চর দেখে অভ্যস্ত বলেই উনি এ দুটোর উপমা টেনেছেন।

আরজ আলী সাহেব বলেছেন,

> **"হাজার হাজার বছরের পুরাতন স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন পৃথিবীতে অনেক আছে। খৃঃ পূঃ তিন হাজার বছরেরও অধিককাল পূর্বে নির্মিত মিশরের পিরামিডসমূহ আজও অক্ষত দাঁড়াইয়া আছে। হজরতের মেরা'জ গমন খুব বেশিদিনের কথা নয়। মাত্র খ্রিস্ট্রীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকের ঘটনা। ঘটনাটি বাস্তব হইলে- যে সকল দৃশ্য তিনি মহাশূন্যে স্বচক্ষে দেখিয়া ছিলেন (আরশ-বেহেশত-দোযখ),**

> **তাহা আজও সেখানে বর্তমান থাকা উচিত। কিন্তু আছে কি? থাকিলে তাহা আকাশ বিজ্ঞানীদের দূরবীনে ধরা পড়ে না কেন?"**

হাস্যকর দাবি! বার বার তিনি হাবলের টেলিস্কোপে জান্নাত-জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করার কথা বলেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিরাজ ছিল একটি মিরাকল। এটি কেবল উনার জন্যই। জান্নাত-জাহান্নাম পৃথিবীতে বসে প্রত্যক্ষ করার মতো কোনো স্থান বা বস্তু নয়। এটা পারলৌকিক বিষয়। এই অদেখা, অদৃশ্য বিষয়ের ওপর বিশ্বাসের নাম ঈমান।

আবার ধরে নিলাম মহাশূন্যের কোনো এক জায়গায় জান্নাত-জাহান্নাম অবস্থিত। ফাইন। কিন্তু আরজ আলী সাহেবদের আকাশবিজ্ঞানীদের দুরবিন কি সেখানে পৌঁছাতে পারবে? এসব আকাশবিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের কতটুকুই জানতে পেরেছে বা রপ্ত করতে পেরেছে?

আগেই আলোচনা করেছি, বিজ্ঞানী সংস্থা নাসার হিসাবে বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের মাত্র ৫ % এর মতো জানতে পেরেছে বা বুঝতে পেরেছে। আর বাকি ৯৫ % সম্পর্কে বিজ্ঞান কিছুই জানে না। তো এই হচ্ছে আরজ আলী সাহেবদের বিজ্ঞানের দৌড়। তথাকথিত বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগে বসে সে মাত্র ৫ % জ্ঞান আমাদের জানাতে পারছে। হায়! আরজ আলী সাহেবদের মতো বিজ্ঞানপূজারিদের জন্য আমাদের মায়া হয়।

আরজ আলী সাহেব বলেছেন,

> **"আলোর চেয়ে দ্রুত গতিতে বা আলোর সমপর্যায়ের গতিতে কোনো কিছুই যেতে পারে না। তাহলে বোরাক নামের একটা জানোয়ারের পিঠে চড়ে মুহাম্মাদ কীভাবে আকাশভ্রমণ করলেন? আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। তাহলে বোরাকের গতি কী রকম?"**

মজার প্রশ্ন বটে! প্রথমত, বোরাক গরু, গাধার সদৃশ কোনো জন্তু ছিল না সেটা আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি। বোরাক ছিল একটা বিশেষ বাহন। আরজ আলী সাহেব যা জানত না তা হলো, বোরাক শব্দটি এসেছে 'বারক্বুন' থেকে। বারক্বুন অর্থ : বিজলি। বিজলি অর্থ আলো। আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার

মাইল। সুতরাং আলটিমেইটলি বোরাকের গতিও প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। তাই হতে পারে বোরাক দ্বারা আলোর গতি বুঝিয়েছেন। আবার হতে পারে তা অন্য কোনো আলো যা আরও অধিক গতিসম্পন্ন। হায়! আরজ আলী সাহেবেরা যদি জানত!

তিনি বলেছেন,

> **"পরিমাপযোগ্য সবকিছুর ইউনিট থাকে। অর্থাৎ পরিমাপের একক। তাহলে নেকীর যে বিভিন্ন পরিমাপের কথা উল্লেখ আছে, নেকী পরিমাপের একক কী?"**

আচ্ছা, যদি আমি প্রশ্ন করি, 'তুমি আমাকে কতটুকু ভালোবাসো?'

বলুন তো, ভালোবাসা কি দেখা যায়? ধরা যায়? ভালোবাসা পরিমাপ করা যায়? ভালোবাসা পরিমাপের একক কী? যদি না যায়, তাহলে ভালোবাসা পরিমাপের কথা কোত্থেকে আসে?

তাহলে বোঝা গেল, সব জিনিস পরিমাপের একক বোঝানো যায় না, বাটখারা নির্ধারণ করা যায় না। যদিও সেটার একটি পরিমাণ অবশ্যই রয়েছে। সেটা অবস্থা ও বস্তু অনুসারে নির্ধারিত হয়।

আবার তিনি বলেছেন,

> **"পাপের কি ওজন আছে? যদি না থাকে, তাহলে পরকালে পাপের পরিমাপ করে শাস্তি-পুরস্কারের বিধান কেন?"**

মজার প্রশ্ন! পাপের ওজন নেই। হিসাব আছে। আর এই হিসাব সংরক্ষণ করা হয় ব্যক্তির আমলনামায়। একটি মিথ্যা কথা একটি পাপ। একটি খুন একটি পাপ... এভাবে ব্যক্তির কৃতকার্য থেকেই পরিমাপ করা হয় সে কত পাপ করেছে বা পুণ্য করেছে।

এরপরে আরজ আলী সাহেব হিন্দুধর্ম তথা পৌত্তলিকতার কিছু আচার টেনে তার সাথে ইসলামিক রিচ্যুয়ালের সামঞ্জস্য বের করে প্রশ্ন করেছেন—

> **"ইসলাম সংস্কারবাদী ধর্ম হলে তার সাথে পৌত্তলিকতার সাদৃশ্য কেন?"**

আচ্ছা, খ্রিষ্টানরাও বিশেষ দিনে রোজা (Fast) রাখে। গির্জায় যায়। প্রার্থনা করে। মুনাজাত করে। তারাও এক আদি সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করে। এখন আপনি যদি এর সাথে ইসলামের একত্ববাদ, সিয়াম, মসজিদে যাওয়া, দোয়া করা ইত্যাদিকে গুলিয়ে খ্রিষ্টানিটির সাথে ইসলামের সাদৃশ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, কেমন দেখায়?

উনি বলেছেন,

> **"শবে বরাতের রাতে নামাজ পড়লে পরবর্তী এক বছরের রুটি-রোজগারে বরকত আসে।"**

কত বড় ডাহা মিথ্যা কথা। শবে বরাতের ফযীলতসম্পর্কিত কোথাও একথা বলা নেই যে, এই রাতে নামাজ পড়লে আগামী এক বছরের রুটি-রোজগারের পথ সুপ্রসন্ন হয়। আরজ আলী সাহেবেরা ধর্ম বিকৃতকারীদের কিছু বিকৃত কথাকে ধর্মের নামে চালিয়ে দিয়ে সরলমনা মুসলিমদের ঈমানহারা করানোর চেষ্টা করেছেন নিঃসন্দেহে।

কোরবানী নিয়ে আরজ আলী সাহেব বলেছেন,

> **'খোদা তা'আলা স্বপ্নে বলিয়াছেন, হে ইব্রাহীম, তুমি তোমার প্রিয় বস্তু কোরবানী করো। এই 'প্রিয় বস্তু' কথাটির অর্থে ইব্রাহীম তাহার পুত্র ইসমাঈলকে বুঝিয়াছিলেন এবং তাই তাহাকেই কোরবানী করিয়াছিলেন। ইব্রাহীমের প্রিয় বস্তু তাহার 'পুত্র' না হইয়া তাহার 'প্রাণ' হইতে পারে না কি?'**

আরজ আলী সাহেব এই জায়গাতেও জঘন্য একটা মিথ্যাচার করেছেন ইসলামের বিরুদ্ধে। সেটি হলো, আল্লাহ তা'আলা নাকি ইব্রাহীম 'আলাইহিস সালামকে স্বপ্নে বলেছেন, হে ইব্রাহীম, তুমি তোমার প্রিয় বস্তু কোরবানী করো। এই মিথ্যাচার করে আরজ আলী সাহেব প্রশ্ন করেছেন—ইব্রাহীমের কাছে প্রিয় বস্তু তার নিজের প্রাণ না হয়ে ছেলের প্রাণ হলো কেন?

অথচ কুরআনে কোথাও এ রকম বলা হয়নি। কুরআনে ইব্রাহীম 'আলাইহিস সালামকে 'প্রিয় বস্তু' বলে কোনো কিছুকে কোরবানী করতে বলা হয়নি; বরং কুরআন সুনির্দিষ্টভাবে ইসমাঈল 'আলাইহিস সালামকেই কোরবানী করতে বলেছিলেন। দেখুন কুরআন কী বলে—

"অতঃপর যখন সে (পুত্রসন্তানটি) তার পিতার (ইব্রাহীম আ. এর) সাথে চলাফেরা করার বয়সে পৌঁছাল, তখন ইব্রাহীম বলল, বৎস, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে আমি তোমাকে কোরবানী করছি। এখন বলো, তোমার অভিমত কী? সে (ইসমাঈল আ.) বলল, 'হে পিতা, আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে আপনি তা-ই করুন। আল্লাহ চাইলে আপনি অবশ্যই আমাকে ধৈর্যশীলই পাবেন।[১]"

দেখুন, কুরআনে স্পষ্ট সন্তান কোরবানী করার কথা উল্লেখ করা আছে, কিন্তু আরজ আলী সাহেব করলেন কী? সন্তানের জায়গায় 'প্রিয় বস্তু' শব্দ বসিয়ে সরলমনা মুসলিমদের জন্য রচনা করলেন একটি আবেগতাড়িত রচনা। এটাই কি তাদের ইসলাম নিয়ে অজ্ঞতা এবং বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ নয়?

'পাথরকে চুম্বন কেন?' এ রকম শিরোনামে আরজ আলী সাহেব মক্কা শরীফে অবস্থিত পবিত্র পাথর 'হাজরে আসওয়াদ' কে চুম্বন করা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

তিনি বলেছেন,

> **'এই পাথর আরশ থেকে পতিত বলেই একে চুমু করা হয়। কিন্তু যাকে চুমু করা হয়, তার মমতাবোধ বা সুখানুভূতি থাকা আবশ্যক। যার মমতাবোধ বা সুখানুভূতি নাই, তাকে চুম্বন করার কোনো মানে থাকে না। হাজরে আসওয়াদ একখানা চেতনাবিহীন নিরেট পাথরমাত্র। তাকে চুম্বন করার উপকারিতা কী?'**

আরজ আলী সাহেব ইসলামধর্মকে বাতুল প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি মূলত দারুণ একটি হাসির খোরাক আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, 'যাকে চুমু খাওয়া হয়, তার মধ্যে মমতাবোধ বা

---

১ সূরা আস-সাফফাত (৩৭) : ১০২

সুখানুভূতি থাকা আবশ্যক।' আচ্ছা, মা যখন সুদূর প্রবাসী ছেলের ফটোগ্রাফ, কিংবা মৃত সন্তানের ব্যবহার্য বা রেখে যাওয়া কোনো স্মৃতিকে চুমু খায়, আদর করে, বুকে জড়িয়ে রাখে, ওই ফটোগ্রাফ বা মৃত সন্তানের রেখে যাওয়া কোনো স্মৃতিবস্তুর মধ্যে কি কোনো রকম মমতাবোধ বা সুখানুভূতি আছে? মায়ের চুমু খেয়ে ছেলের ফটোগ্রাফ কি কথা বলে ওঠে? নাহ। এসবের কিছুই হয় না। তাহলে এ রকম একটি জড়বস্তুকে চুমু খাওয়ার, বুকে আগলে ধরার কি কোনো দরকার আছে?

এইবার আরজ আলী সাহেবের ভক্তগণ ফুঁসে উঠতে পারেন। তারা হয়তো বলবে, 'আরে আরে! মা তো ফটোগ্রাফটিকে চুমু খেত না যদি না সেটা সন্তানের স্মৃতি বহন না করত। এটার মানে এই নয় যে, মা কেবল জড়বস্তুর মতন একটি ফটোগ্রাফকে চুমু খাচ্ছেন।'

ওয়েল! মুসলিমরাও 'হাজরে আসওয়াদ' নামক পাথরটিকে চুমু খেত না যদি না সেটা জান্নাতের পাথর হতো। মুসলিমরা এটাকে চুমু খায় কারণ, এই পাথর বিশেষ একটি স্মৃতি বহন করে। এটার মানে এই না যে, এই পাথরে চুমু খাওয়া মানে পাথরের ইবাদাত করা।

এই 'হাজরে আসওয়াদ' যে কেবল একটি পাথর ছাড়া আর কিছুই নয়, সেটা ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এর নিম্নোক্ত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় :

হাজরে আসওয়াদকে সম্বোধন করে একবার ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেছিলেন,

"হে কালো পাথর, আমি অবশ্যই জানি তুমি নিছক পাথর, ভালো কিংবা মন্দ করার ক্ষমতা তোমার নেই। যদি আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমাকে চুমু খেতে না দেখতাম, তাহলে আমি কখনোই তোমাকে চুমু খেতাম না"।[১]

আরজ আলী মাতুব্বররা যেটা ইসলাম নয়, সেটাকেই ইসলাম বলে প্রচার করেছেন, আর যেটা সত্যিকারের ইসলাম, সেটা জেনে হোক বা না জেনে হোক, এড়িয়ে গেছেন।

---

১ তিরমিযী, হাদিস : ৮৬০
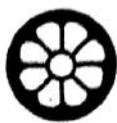
প্রকৃতি বিষয়ক

আরজ আলী মাতুব্বর তাঁর সত্যের সন্ধান বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন 'প্রকৃতি বিষয়ক'। খুব সংক্ষিপ্ত এই অধ্যায়ে আরজ আলী সাহেব কিছু প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। এই প্রশ্নগুলোর মধ্যে হিন্দুধর্মের কিছু কিছু পৌরাণিক এবং খ্রিষ্টধর্মের ধর্মীয় কিতাবাদির ওপর। যেহেতু আমি একজন মুসলিম এবং হিন্দুধর্ম ও খ্রিষ্টধর্ম আমার আলোচনার বিষয়বস্তু নয়, তাই আমি এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার দরকার মনে করিনি।

'প্রকৃতি বিষয়ক' অধ্যায়ের প্রথম প্রশ্নটি ছিল—

| **'মানুষ ও পশুতে সাদৃশ্য কেন?'**

অধ্যায়টির অবতারণা করতে গিয়ে আরজ আলী সাহেব তিন লাইনে দুটি ভুল তথ্য দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন,

| **"পবিত্র মক্কার মাটি দ্বারা বেহেস্তের মধ্যে আদমের মূর্তি গঠিত হয়।"**

অথচ কুরআন এবং হাদীসের কোথাও এর কোনোরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না যে আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা আদম 'আলাইহিস সালামকে মক্কা শরীফের মাটি থেকেই সৃষ্টি করেছেন। কুরআনে আদম 'আলাইহিস সালাম এর গঠনপ্রক্রিয়া নিয়ে

অনেকগুলো আয়াত আছে। যেমন :

'নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে ঈসার সাদৃশ্য হচ্ছে আদমের মতোই। তাকে তিনি কাদামাটি থেকে সৃষ্টি করেন'।[১]

সহীহ বুখারীর হাদীসে বলা আছে,

আবু মূসা আল আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, 'পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রাপ্ত মাটি দ্বারাই আদমকে সৃষ্টি করা হয়। তাই আদমের সন্তানেরা ঠিক মাটির অনুপাতে কেউ (দেখতে) সাদা, কেউ গৌরবর্ণ, কেউ কালো এবং কেউ হয় মাঝামাঝি রকমের।[২]'

উপরিউক্ত হাদীস থেকে আদম 'আলাইহিস সালাম মক্কা শরীফের মাটি নয়; বরং পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার মাটি থেকেই সৃষ্ট, এটাই প্রতীয়মান হয়। এই হাদীসের কোথাও কিন্তু আমরা স্পেসেফিক 'মক্কা শরীফের' নাম দেখতে পাই না; বরং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মাটি থেকেই যে আদম 'আলাইহিস সালাম সৃষ্ট, সে ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা পাই। তাহলে দেখা যাচ্ছে, অধ্যায়ের শুরুতেই আরজ আলী সাহেব এমন একটি তথ্য দিয়ে ইসলামধর্মকে আক্রমণ শুরু করলেন, যা আদতে ইসলামের সাথে কোনোভাবেই সম্পর্কিত নয়।

একই অধ্যায়ে আরজ আলী মাতুব্বর বলেছেন,

'ধর্মযাজকগণ বলেন, জগতের যাবতীয় জীব নাকি একই সময়ে সৃষ্টি হয়েছিল!'

প্রথমত, ইসলামধর্ম যে জিনিস দুটোর ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে তা হলো কুরআন এবং সুন্নাহ। ইসলাম কোনো ধর্মযাজকের মুখের বুলির ওপর নির্ভর করে চলে না। একজন ধর্মজাযক কী বলেছেন বা বললেন তা কখনোই ইসলামধর্মের পক্ষে যুক্তি নয়। দেখতে হবে কুরআন এবং সুন্নাহর মধ্যে কী বলা আছে। পবিত্র কুরআন কিংবা হাদীসের কোথাও এমনটি বলা নেই যে, জগতের সকল প্রাণী একই সময়ে সৃষ্ট।

১ সূরা আলে ইমরান (০৩) : ৫৯
২ তিরমিযী, হাদিস নং : ২৯৫৫

অধ্যায়ের শুরুতেই এ রকম দুটি ভুল তথ্য দিয়ে আরজ আলী সাহেব এগিয়েছেন। আমরা দেখব তিনি আরও কী রকম তথ্য আমাদের সামনে হাজির করেন।

মানুষ ও পশুতে সাদৃশ্য নিয়ে আরজ আলী সাহেব প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেছেন,

> **'মানুষের রক্তের প্রধান উপাদান- শ্বেত রক্তকণিকা, লোহিত কণিকা, জল ও লবণ জাতীয় কিছু পদার্থ এবং দেহ বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যায়- লৌহ, কার্বন, ফসফরাস ও গন্ধকাদি জাতীয় কতিপয় মৌলিক পদার্থ। অন্যান্য জীবের রক্তের উপাদানও উহাই কেন?'**

মজার প্রশ্ন বটে! মানুষ এবং প্রাণীদের শরীরের গাঠনিক উপাদান এক হওয়াটা কেনই-বা ধর্মকে একহাত নেওয়া টাইপ প্রশ্নের মধ্যে পড়ল বুঝলাম না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন যে, সকল প্রাণীর গাঠনিক উপাদান একই। তিনি বলেন,

'প্রাণসম্পন্ন সবকিছুকে আমি পানি থেকেই সৃষ্টি করেছি।[১]'

লক্ষ করুন, আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা বলছেন, প্রাণ আছে এমন সবকিছুকেই তিনি পানি থেকেই সৃষ্টি করেছেন। মানুষের প্রাণ আছে। জীবজন্তুরও প্রাণ আছে। তাহলে উভয়েই প্রাণী। এখন উভয়েই প্রাণী হলে, কুরআনমতে উভয়ের সৃষ্ট উপাদান একই। সেটি হলো পানি। তাহলে যাদের কোষের মৌলিক উপাদানটাই এক, তাদের অন্যান্য গাঠনিক উপাদানও একই হবে, এতে আশ্চর্য হবার কিংবা প্রশ্ন তোলার কিছু আদৌ আছে কি?

পবিত্র কুরআন আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করেছে যে মানুষ এবং প্রাণী পানি থেকেই সৃষ্ট। যেমন :

'তিনিই আল্লাহ যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে।[২]'

---

১ সূরা আল আম্বিয়া (২১) : ৩০
২ সূরা আল ফুরকান (২৫) : ৫৪

আবার বলা হচ্ছে,

'এবং আল্লাহ প্রত্যেক প্রাণীকে পানি থেকেই সৃষ্টি করেছেন।[১]'

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কুরআনের ভাষ্যমতেই মানুষ এবং প্রাণীদের শরীরের একেবারে গাঠনিক উপাদান এক। সেটা হলো পানি। আর গাঠনিক উপাদান যেখানে একই, সেখানে অন্যান্য উপাদানও একই হবে, এটাই স্বাভাবিক।

একটি ছোট্ট উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাপারটা বোঝা যাক। ধরুন একজন ইঞ্জিনিয়ারকে পাশাপাশি দুটি বাড়ি বানাতে দেওয়া হলো। ইঞ্জিনিয়ার কি একই রকম, একই স্টাইলে, একই ডিজাইনে বাড়ি দুটি বানাবেন? নিশ্চয়ই না। তিনি দুটি ভিন্ন আকার, আকৃতি, ডিজাইনে বাড়ি দুটি বানাবেন। এখন একই ইঞ্জিনিয়ারের বানানো বাড়ি দুটি দেখে কেউ যদি প্রশ্ন করে, 'আরে আরে! এই বাড়িতে ইট ব্যবহার করেছেন, ওই বাড়িতেও ইট কেন? এই বাড়িতে সিমেন্ট, রড ব্যবহার করেছেন, ওই বাড়িতেও একই জিনিস কেন ব্যবহার করেছেন? ভিন্ন কিছু ব্যবহার করলেন না কেন?

পাঠক, আপনার কমনসেন্স কী বলে? প্রশ্নটি কি আদৌ যৌক্তিক? আপনার কাছে এই প্রশ্নটিকে যদি যৌক্তিক মনে না হয়, তাহলে আরজ আলী সাহেবের প্রশ্নটা কতটুকু যৌক্তিক ভাবুন তো! যে সকল জীববিজ্ঞানীরা নিজেদের বিবর্তনবাদী বলে পরিচয় দেয়, তাদের কেউই কখনোই এই প্রশ্নটা উত্থাপন করেনি যে, 'স্রষ্টা যদি থাকবেনই, তাহলে প্রাণী আর মানুষের গাঠনিক উপাদান এক কেন?' তারা এই প্রশ্নটা করেনি বা করে না এ জন্যই, কারণ এই প্রশ্নটা আদৌ প্রশ্ন হবার যোগ্যতাই রাখে না।

এটা তো গেল মানুষ এবং পশু বা প্রাণীর শরীরের মধ্যকার গাঠনিক উপাদান নিয়ে আরজ আলী সাহেবের বিভ্রান্তিমূলক যুক্তি। এর একটু পরে তিনি *'আকাশ কী'* শিরোনামে লিখেছেন,

> **'আকাশ বলিতে সাধারণত শূন্যস্থান বুঝায়।'**

---

১ সূরা আন নূর ২৪ : ৪৫

আরজ আলী সাহেবের প্রতি যথাযথ সম্মান রেখে বলতে চাই, বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানবিষয়ক কোনো ব্যাপারেই উনার সঠিক কোনো জানাশোনা ছিল না। এ জন্যই উনি নানান সময়ে বৈজ্ঞানিক ব্যাপারগুলোকে নিজের মতো করে বুঝেছেন এবং সে বুঝ অনুসারে যুক্তি সাজিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'আকাশ বলিতে সাধারণত শূন্যস্থান বুঝায়'। কিন্তু, আকাশ বলতে কখনোই শূন্যস্থান বোঝায় না। জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করে বা এই সম্পর্কে ধারণা রাখে এমন যে কেউ জানেন, আকাশ মানে কখনোই 'শূন্যস্থান' নয়। উইকিপিডিয়াতে 'Sky' বা 'আকাশ' সম্পর্কে বলা আছে, 'The sky (or celestial dome) is everything that lies above the surface of the Earth, including the atmosphere and outer space.'

অর্থাৎ আকাশ হচ্ছে এমন কিছু যা আমাদের পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ থেকে ওপরের দিকে অবস্থিত। আরও একটু আগালে উইকিপিডিয়া আরও জানাচ্ছে, 'In the field of astronomy, the sky is also called the celestial sphere. This is viewed from Earth's surface as an abstract dome on which the Sun, stars, planets, and Moon appear to be traveling'

অর্থাৎ সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র সবকিছুকে নিয়েই হচ্ছে আকাশ। এমতাবস্থায়, আমরা যদি আরজ আলী সাহেবের মতো ধরে নিই যে, আকাশ মানে শূন্যস্থান, তাহলে এসব গ্রহ, নক্ষত্রাদি, যা আকাশেরই অংশ, সেসবও কি শূন্য বা শূন্যস্থান? নাহ। সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি মিলে যদি আকাশ হয়, তাহলে আকাশ কখনোই শূন্যস্থান বলে কিছু নয়। আর বর্তমান দুনিয়ার বাঘা বাঘা পদার্থবিজ্ঞানীরা প্রায়ই একটি সুন্দর বুলি আওড়িয়ে থাকেন। সেটা হচ্ছে, 'প্রকৃতি শূন্যস্থান পছন্দ করে না'। প্রকৃতি শূন্যস্থান পছন্দ করে না বলেই প্রকৃতি কখনোই কোনো কিছু শূন্য রাখে না। এমতাবস্থায়, প্রকৃতিরই অংশ 'আকাশ' কীভাবে শূন্য হতে পারে?

এরপরেই আরজ আলী সাহেব লিখেছেন,

> **'কেহ কেহ সপ্তাকাশকে পদার্থের তৈয়ারি বলিয়া মনে করেন। তাহারা বলেন যে আকাশ প্রথমটি জলের, দ্বিতীয় লৌহের, তৃতীয় তাম্রের, চতুর্থ স্বর্ণের তৈয়ারি। উহারা আরও বলেন যে, ছাদে ঝুলান আলোর মতো চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রাদি আকাশে ঝুলান আছে।'**

প্রথমত, ইসলামের কোথাও কোন আকাশ কোন পদার্থের তৈরি তা নির্ধারণ করে বলা হয়নি। কিন্তু বিভিন্ন গ্রহ, নক্ষত্রাদি ইত্যাদিকে যদি আকাশের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে বলতে হয় যে আকাশ অবশ্যই কোনো নির্দিষ্ট পদার্থের তৈরি। কারণ, গ্রহ, নক্ষত্রগুলো বিভিন্ন রকম পদার্থ যেমন : পাথর, কপার, পটাশিয়াম, সালফার, ম্যাগনেশিয়াম ইত্যাদি দ্বারা তৈরি।

এরপর আরজ আলী সাহেব প্রথম আকাশ জলের, দ্বিতীয় আকাশ লোহার, তৃতীয় আকাশ তাম্রের, চতুর্থ আকাশ স্বর্ণের বলে যে মতবাদ ধর্মের বলে ব্যক্ত করেছেন, তার সাথে ইসলামের, অর্থাৎ কুরআন এবং হাদীসের ছিটেফোঁটা সম্পর্কও নেই। এগুলো তাঁর এলাকার কোনো পুথি বা ওয়াজের বাণী হলে হতে পারে, সেটার সাথে ইসলামের সম্পর্ক নেই।

একই অভিযোগের শেষে আরজ আলী সাহেব বলেছেন, ধর্মে নাকি বলা হয়েছে চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রাদি আকাশে ঝুলানো আছে। এই অভিযোগটি পুরোপুরিই মিথ্যা। অন্যান্য ধর্মের ব্যাপারে জানা নেই, ইসলামধর্মের কোথাও উল্লেখ নেই যে চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রাদি আকাশে ঝুলানো আছে। বরং প্রাচীনকালের মানুষ যখন মনে করত যে সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি গ্রহ, নক্ষত্র স্থির, ঠিক সে সময় বসে কুরআন একেবারে আধুনিক বিজ্ঞানের সুরেই কথা বলেছে সূর্য, চন্দ্রের ব্যাপারে। কুরআন বলেছে,

“সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনের নাগাল পাওয়া। প্রত্যেকে আপন আপন কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে।[১]”

অধুনা আধুনিক বিজ্ঞানও আমাদের জানাচ্ছে, সূর্য, চাঁদসহ প্রত্যেকটি গ্রহ-নক্ষত্রের রয়েছে আলাদা আলাদা কক্ষপথ এবং এই কক্ষপথ ধরেই তারা আবর্তিত হয়। পবিত্র কোরআনুল কারীম সূর্য, চন্দ্রকে আকাশে ঝুলানো বলে উল্লেখ করেনি, তারা যে নিজেদের কক্ষপথে আবর্তিত, সেটাই উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু সূর্য অবশ্যই তার নিজের কক্ষপথের বাইরে যেতে পারে না। চাঁদও তার নিজের কক্ষপথের বাইরে যেতে পারে না। মোদ্দাকথা, কোনো গ্রহ—নক্ষত্রই তার

---

১ সূরা ইয়াসীন (৩৬) : ৪০

নিজের কক্ষপথ ছেড়ে বাইরে আসতে পারে না। অর্থাৎ তারা তাদের নির্দিষ্ট একটা বিন্দু বা কেন্দ্রকে ঘিরে আবর্তিত হয়। এখন তারা যেহেতু একই কেন্দ্রকে ঘিরেই আবর্তিত হয়, নিজেদের জায়গা পরিবর্তন করে না, সেহেতু এই ব্যাপারটাকে যদি আরজ আলী সাহেব 'আকাশে ঝুলানো' ধরে নিয়ে ধর্মের সমালোচনায় নেমে পড়েন, তাহলে এটা নেহাত তাঁর জ্ঞান, জানা বা বোঝার স্বল্পতা। ধর্মেরই-বা কী দোষ?

আরজ আলী সাহেব বলেছেন,

> **'কোনো কোনো ধর্মাচার্য বলিয়া থাকেন যে, আকাশ সাতটি। ইহা কী রূপে হয়? যাহা শূন্য তাহা সংখ্যা দ্বারা সূচিত হয় কী রূপে? যাহারা আকাশকে সংখ্যা দ্বারা বিভক্ত করেন, তাহারা কি আকাশ বলিতে গ্রহকে বুঝেন?'**

প্রথমত, আমরা আগেই দেখিয়েছি, আকাশ বলতে কখনোই কোনো শূন্যস্থানকে বোঝায় না। তাহলে আরজ আলী সাহেবের বক্তব্য 'যাহা শূন্য তাহা সংখ্যা দ্বারা সূচিত হয় কী রূপে' এই কথাটি একটি ভুল কথা। ভুল তথ্য। আকাশ শূন্যজাতীয় কিছু নয়। যদি আকাশ শূন্যজাতীয় কিছু না হয়, তাহলে আরজ আলী সাহেবের যুক্তিকে উল্টিয়ে দিয়ে বলা যায় যে যেহেতু আকাশ শূন্যজাতীয় কিছু নয়, সেহেতু আকাশকে সংখ্যা দ্বারা সূচিত করা যাবে।

এখন, কুরআন 'সাত আকাশ' জাতীয় কোনো কিছুর কথা বলেছে কি না? হ্যাঁ, বলেছে। কুরআন বলছে,

'বস্তুত তিনিই তৈরি করেছেন সপ্তাকাশ... [১]'

আলোচ্য আয়াতের অর্থ আসমান সাতটি, আর তা-ই সত্যকথন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস থেকেও আমরা অনুরূপ স্পষ্ট ভাষ্য পেয়ে থাকি। যতক্ষণ পর্যন্ত বিজ্ঞান আকাশের রহস্য ভেদ না করবে, আকাশের সঠিক সংখ্যা কুরআন ও হাদীসের বিপরীত সংখ্যার প্রমাণ করতে পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত

১ সূরা আল বাক্বারা (০২) : ২৯

কুরআন ও সুন্নাহয় দেওয়া সংখ্যা অস্বীকার করার পক্ষে আরজ আলী সাহেবদের কোনো প্রমাণ নেই। সুতরাং আমরা বিশ্বাস করছি যে আকাশ সাতটি।

এখন আসুন, আসলেই অসংখ্য আকাশ আছে কি না? কুরআন থেকে আকাশের সংজ্ঞা এবং এর সম্পূর্ণ বর্ণনা পাওয়া যায় না আসলে। আমরা ধরে নিই যে এসব গায়েবের ব্যাপার। এসব ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন। তবে, বর্তমান বিজ্ঞান Multi Universe নামে একটি থিওরির কথা আমাদের জানাচ্ছে। তাদের কথা অনুসারে, আমাদের মহাবিশ্বের বাইরে, আমাদের মহাবিশ্বের মতো অসংখ্য মহাবিশ্ব রয়েছে। আমাদের মহাবিশ্বের বাইরের সবকিছু যেহেতু আকাশের অন্তর্গত এ কথাটিও আমরা বলি না। তা ছাড়া Multi Universe মানে কি সেই অসংখ্য আকাশ বা অসংখ্য মহাবিশ্ব? সেটাও আমাদের কাছে প্রমাণিত কথা নয়। এসবই ধারণামাত্র। ধারণা করা কথাকে আমরা কুরআনের বাণীর মতো মহাসত্য বাণীর বিপরীতে দাঁড় করাতে পারি না। সুতরাং আমি এ কথা বলছি না যে কুরআনের 'সপ্তাকাশ' তথা 'অসংখ্য আকাশ' ধারণার সাথে বিজ্ঞানের 'Multi Universe' তত্ত্বের মিল রয়েছে, আমি শুধু এটুকু বলছি, বিজ্ঞানীদের দেওয়া আকাশের সংজ্ঞা অনুসারে ধরে নিয়ে আগালে দেখা যায়, অসংখ্য আকাশের অস্তিত্ব খোদ বিজ্ঞান-মহলের আলোচ্য বিষয়। তাহলে আরজ আলী সাহেবরা বিজ্ঞান না জেনে, না বুঝে ধর্মকে সব সময় একহাত নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকেন কেন?

এই অধ্যায়ে আরজ আলী সাহেব *'দিবা রাত্রির কারণ কী'*, *'পৃথিবী কিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত'* এবং *'ভূমিকম্পের কারণ কী'* শিরোনামে তিনটি প্রশ্ন করেছেন।

প্রথম প্রশ্নে তিনি বলেছেন,

> **'কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে চতুর্থ আসমানে একখানা সোনার নৌকায় সূর্যকে রাখিয়া ৭০ হাজার ফেরেশতা সূর্যসহ নৌকাখানা টানিয়া পূর্ব দিক হইতে পশ্চিম দিকে লইয়া যায় ও সারা রাত আরশের নিচে বসিয়া আল্লাহর এবাদত করে এবং প্রাতে সূর্য পুনরায় পূর্ব দিকে হাজির হয়।'**

দ্বিতীয় প্রশ্নে বলেছেন,

> **'কেহ কেহ বলেন পৃথিবী একটি বলদের শৃঙ্গের ওপরে আছে। কেহ বলেন, পৃথিবী একটি মাছের ওপরে এবং কেহ বলেন, পৃথিবী জলের ওপরে অবস্থিত। তাহাই যদি হয়, তবে সেই মাছ, বলদ, জল কীসের ওপরে অবস্থিত?'**

তৃতীয় প্রশ্নে আরজ আলী সাহেব বলেছেন,

> **'কেহ কেহ বলেন যে, পৃথিবীধারী বলদ ভারাক্রান্ত হইয়া কখনও কখনও শৃঙ্গ পরিবর্তনের চেষ্টা করে এবং তাহার ফলে পৃথিবী কম্পিত হয়। যদি ইহাই হয়, তবে একই সময়ে পৃথিবীর সকল অঞ্চলে ভূমিকম্প হয় না কেন?'**

বিজ্ঞ পাঠক, ওপরে আরজ আলী সাহেবের প্রশ্ন তিনটি পড়ে নিশ্চই হাসছেন। আমার বুঝে আসে না, এ রকম কৌতুকময় জিনিসকে, যার সাথে ইসলামের ন্যূনতম কোনো সম্পর্কই নেই, সেসব বিষয়কে ইসলামের সাথে জুড়ে দিয়ে তিনি কীভাবে ইসলামের সমালোচনায় নামলেন? কোনো কিছুর সমালোচনা করার আগে তো সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে ভালোভাবে জানা লাগে। সেই বিষয়ের অথেনটিক সোর্স থেকে জেনে নিয়ে, এরপরে কোনো কিছু যদি সমালোচনা করার মতন হয়, তবেই না সমালোচনা করা যায়। সেসবের কোনো কিছুই না করে, কিছু পৌরাণিক মুখরোচক গালগল্পকে বিষয়বস্তু বানিয়ে বিশাল সাইজের বই লিখে ফেলা কি কোনো জ্ঞানী মানুষের কাজ?

আরজ আলী সাহেব এরপর আরও বলেছেন,

> **'কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, পৃথিবীধারী বলদ যখন শ্বাস ত্যাগ করে তখন জোয়ার হয় এবং যখন শ্বাস গ্রহণ করে, তখন ভাটা হয়। তাহাই যদি হয়, তাহলে পৃথিবীর সব অঞ্চলে একই সময়ে জোয়ার বা ভাটা হয় না কেন?'**

আরও একটি মজাদার প্রশ্ন। মানুষ যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিছুই জানত না, ঠিক তখন এ রকম কল্পকাহিনি বলে-শুনে তারা দিন পার করত। এমন নয় যে, এ সমস্ত কিছু ধর্মগ্রন্থের কথা। পবিত্র কোরআনুল কারীম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস তন্ন তন্ন করে খুঁজে কোথাও এ ধরনের আজগুবি কিচ্ছা-কাহিনি পাওয়া

যায় না। বরং কুরআনে পৃথিবী, আকাশ এবং মহাকাশ সম্পর্কিত এমন-সব তথ্য জানানো হয়েছে, যা হাল আমলের বিজ্ঞান আমাদের মাত্র সেদিন জানিয়েছে। পৌরাণিক কিচ্ছা-কাহিনি টেনে আরজ আলী সাহেবরা যেভাবে ধর্মের সমালোচনা করেছেন, তাতে আমরা বিবেকবান যে কেউই অবাক হতে বাধ্য।

'উত্তাপবিহীন অগ্নি কী রূপ' শিরোনামে আরজ আলী মাতুব্বর আরেকটি প্রশ্ন করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, 'ইব্রাহীম 'আলাইহিস সালামকে যখন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়, তখন তিনি আগুনে পুড়লেন না কেন? এর কারণ কি এটাই যে তখন প্রকৃতির নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছিল যার ফলে আগুনের দাহ্যশক্তি লোপ পেয়েছে? অথবা অগ্নিকুণ্ডের মধ্যকার অক্সিজেন লোপ পেয়েছিল?'

প্রথমত, ইব্রাহীম 'আলাইহিস সালাম আল্লাহর একজন নবী ছিলেন। একজন দূত। ইব্রাহীম 'আলাইহিস সালাম সেসব মনোনীত বান্দাদের অন্তর্গত, যাদের আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'আলা মানুষকে হেদায়াতের পথ, সিরাতুল মুস্তাকীমের পথে ডাকার জন্যই মনোনীত করেছেন। আল্লাহর এ সমস্ত বান্দাদের ওপর পৃথিবীতে নেমে এসেছিল নানান বিপদ, পরীক্ষা। এই পরীক্ষাগুলো থেকে আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের রক্ষা করেছিলেন। এই পরীক্ষাগুলোও এসেছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে। আবার রক্ষাও করেছিলেন আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা। তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে, তিনি যদি রক্ষা করবেনই, তাহলে পরীক্ষাটাই-বা কেন নিলেন?

উত্তর হচ্ছে, আল্লাহ পরীক্ষাটা এ জন্যই করেন যে, তিনি দেখতে চান তাঁর প্রিয় বান্দারা চরম বিপদের মুখে, দুর্যোগঘন মুহূর্তে কার ওপর ভরসা করে। তারা কি তাগুতের সাথে আপস করে, নাকি মাথা বাতিলের কাছে নত না করে শাস্তিকে বরণ করে নেয়। যখনই বান্দা তাঁর সেই ধৈর্যের পরীক্ষায় শতভাগ উন্নীত হয়ে যান, আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা বান্দাকে তখন অন্য একটি উছিলা দিয়ে বাঁচিয়ে নেন।

এখন ইব্রাহীম 'আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা'আলা অগ্নিকুণ্ডে আগুনের স্পর্শ থেকে রক্ষা করেছেন। নিরাপদ করেছেন। এটা আল্লাহর জন্য খুবই সোজা। এটি একটি মিরাকল। Miracle শব্দটিকে আরেকটি সুন্দর শব্দ দিয়ে বোঝানো যায়। সেটি হলো, Super Natural। Super Natural মানে হচ্ছে অতিপ্রাকৃত। অতিপ্রাকৃত

অর্থ যে ঘটনাগুলো প্রকৃতিতে ঘটে, তার ব্যতিক্রম। যেমন : কেউ আগুনে হাত দিলে তার হাত পুড়ে যাবে। এখন আগুনে হাত দেওয়ার পরেও যদি কারও হাত না পোড়ে, তাহলে এই ঘটনা অতিপ্রাকৃত ঘটনা। ইব্রাহীম 'আলাইহিস সালাম এর সাথে ঘটা ঘটনাটিও ঠিক সে রকম। অতিপ্রাকৃত। এটা আল্লাহর জন্য সহজ এ জন্যই যে আল্লাহ যখন কোনো কিছু করার ইচ্ছা করেন, তিনি কেবল বলেন 'হও', আর তা হয়ে যায়।

ইব্রাহীম 'আলাইহিস সালামকে যখন নমরূদের রক্ষী বাহিনীরা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করছিল, তখন আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা সেই অগ্নিকে শান্ত অর্থাৎ আরামদায়ক ঠান্ডা হয়ে যেতে বলেন। আর তা শান্ত ও আরামদায়ক হয়ে যায়।

এ রকম মিরাকল যে কেবল ইব্রাহীম 'আলাইহিস সালাম এর সাথেই ঘটেছে তা নয়; আল্লাহ সুবাহান ওয়া'তালা ইউনুস 'আলাইহিস সালামকে মাছের পেট থেকে উদ্ধার করেছিলেন। মুসা 'আলাইহিস সালাম এর জন্য সাগরের পানির ওপরে রাস্তা তৈরি করেছিলেন যাতে তিনি ফেরাউনের বাহিনীর অলক্ষে চলে যেতে পারেন। ঈসা 'আলাইহিস সালামকে তিনি পিতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। এর প্রত্যেকটাই প্রকৃতির ব্যতিক্রম।

কেউ আগুনে হাত দিলে পুড়ে যাবে। ইব্রাহীম 'আলাইহিস সালামকে আগুনে নিক্ষেপ করার পরও তাঁর কিছুই হয়নি, কারণ এটা ছিল মিরাকল।

কেউ সামুদ্রিক মাছের পেটে চলে গেলে বাঁচতে পারে না। কিন্তু ইউনুস 'আলাইহিস সালাম বেঁচেছিলেন। কারণ, এটা ছিল মিরাকল। কেউ পিতা ছাড়া জন্ম লাভ করতে পারে না। কিন্তু ঈসা 'আলাইহিস সালাম পিতা ছাড়াই জন্ম লাভ করেছেন। এটাই মিরাকল। সুপার ন্যাচারাল মানেই অতিপ্রাকৃত। যা প্রাকৃতিক ব্যাখ্যার বাইরে।

এখন যা কিছুই অতিপ্রাকৃত, অর্থাৎ প্রাকৃতিক ব্যাখ্যার উর্ধ্বে, সেগুলোকে প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা দিয়ে বোঝার চেষ্টা করলে বিভ্রান্তি ছড়ানোই স্বাভাবিক।

আপনি যখন একজন 'স্রষ্টা'কে ধরে নিয়ে এই ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যা জানতে চাইবেন, তখন আপনি কিন্তু আল্টিমেটলি ধরে নিচ্ছেন যে 'স্রষ্টা' বলে কেউ একজন আছে। এখন এরপরের প্রশ্ন, স্রষ্টা এ রকম ঘটনা কীভাবে ঘটান, তাই না? তাহলে আপনার কাছে আমার প্রশ্ন, 'এসব প্রাকৃতিক নিয়মের সৃষ্টিকর্তা কে?'

- 'স্রষ্টা।'
- 'স্রষ্টা কি এসব নিয়মের অধীন?'
- 'না।'
- 'নিয়ম কি স্রষ্টার নিয়ন্ত্রক, নাকি স্রষ্টাই নিয়মের নিয়ন্ত্রক?'
- 'স্রষ্টাই নিয়মের নিয়ন্ত্রক।'
- 'তাহলে যিনি নিয়ন্ত্রক, তিনি কি চাইলে যেকোনো সময় তাঁর নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাতে পারেন না?'
- 'পারেন...'
- 'তাহলে এটা কি স্রষ্টার জন্য খুব কঠিন যে প্রকৃতির নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে ইব্রাহীম 'আলাইহিস সালামকে অগ্নিকুণ্ড থেকে বাঁচিয়ে নেওয়া?'

ওপরের সমীকরণ আরও একবার পড়ে আসুন। যদি ওপরের সমীকরণ যৌক্তিক হয়, তাহলে এটা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ যে প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটানো।

এই অধ্যায়ে আরজ আলী সাহেবের একেবারে শেষ প্রশ্ন ছিল,

> **'নূহ 'আলাইহিস সালাম এর সময়কার মহাপ্লাবন কি পুরো পৃথিবী জুড়েই হয়েছিলো?'**

এই প্রশ্নের অবতারণা করতে গিয়ে আরজ আলী সাহেব বেশ কিছু যুক্তি দেখিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন আদম 'আলাইহিস সালাম কত খ্রিষ্টপূর্ব সালে পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন। পৃথিবীতে আগমন করেই তিনি কোন উদ্যানে নেমেছিলেন। আদম 'আলাইহিস সালাম থেকে ঠিক কত বছর পরে নূহ 'আলাইহিস সালাম এসেছিলেন। এর ঠিক কত বছর পরে সেই মহাপ্লাবন হয়েছিল। মহাপ্লাবন থেকে বাঁচতে নূহ 'আলাইহিস সালাম আল্লাহর হুকুমে যে নৌকা তৈরি করেছিলেন, সেই নৌকার আয়তন কত, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ কত এসবও উল্লেখ করেছেন আরজ আলী সাহেব।

পাঠক, মজার ব্যাপার হলো, আরজ আলী সাহেব এই তথ্যগুলোর প্রত্যেকটাই নিয়েছেন খ্রিস্টানদের বাইবেল থেকে। ইসলামিক অথেনটিক সোর্স, কুরআন, হাদীসের কোথাও এই কথাটি বলা নেই যে আদম 'আলাইহিস সালাম কত সালে

পৃথিবীতে এসেছেন, নূহ 'আলাইহিস সালাম কত সালে এসেছেন, মহাপ্লাবন কত সালে হয়েছে ইত্যাদি।

এখন, বাইবেলের হিসাব ধরে নিয়ে এসে কুরআন বা হাদীসকে আক্রমণ করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। কুরআন-হাদীস যেহেতু এ সমস্ত ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনো টাইম ফ্রেমের উল্লেখ করেনি, সেহেতু ঠিক কত বছর বা কত বিলিয়ন বছর আগে আদম 'আলাইহিস সালাম এসেছিলেন, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

আবার টাইম ফ্রেম উল্লেখ করে আরজ আলী সাহেব ধর্মীয় কিতাবাদির যে অসংগতি দেখানোর চেষ্টা করেছেন, সেটা একান্তই বাইবেলের সাথে যায়, যেহেতু বাইবেল এসব ব্যাপারে নির্দিষ্ট টাইম ফ্রেম উল্লেখ করে দিয়েছে। কুরআন যেহেতু সেটা করেনি, তাই এই যুক্তি দিয়ে কুরআনের সমালোচনা করার যথেষ্ট যৌক্তিকতা নেই।

এখন নূহ 'আলাইহিস সালাম এর সময়কার সেই মহাপ্লাবন কি পৃথিবীর সর্বত্র হয়েছিল?

আরজ আলী সাহেব এই জায়গায় বাইবেলের টাইম ফ্রেম ধরে দেখিয়েছেন, এই মহাপ্লাবন পৃথিবীর সর্বত্র হওয়া সম্ভব না। কারণ, এই টাইম ফ্রেমেই যদি সেই মহাপ্লাবন হয়ে থাকে, তাহলে ঐতিহাসিক প্রমাণ থেকে দেখা যায়, ঠিক এই সময়টাতে পৃথিবীর আরও বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সভ্যতা বহাল তবিয়তে বর্তমান ছিল। সেই মহাপ্লাবন সারা পৃথিবীব্যাপী হলে তো এসব সভ্যতা থাকার কোনো প্রশ্নই আসে না। তাহলে কি সারা দুনিয়াব্যাপী সেই মহাপ্লাবনের ঘটনা মিথ্যা?

এখানে প্রথমত যে জিনিসটা আমাদের স্মরণে রাখা উচিত তা হলো, নূহ 'আলাইহিস সালাম এর সময়কার সেই মহাপ্লাবন ঠিক কোন সময়টাতে হয়েছিল তার কোনো নির্দিষ্ট দিন, তারিখ কোনো কিছুই কুরআন-হাদীসে উল্লেখ নেই। যেহেতু এসবের কোনো ইঙ্গিত কুরআন-হাদীস দেয় না, সেহেতু বাইবেলের টাইম ফ্রেমে কুরআনকে বসিয়ে বিচার করাটা ভুল।

দ্বিতীয়ত, কুরআন কিন্তু স্পষ্ট করে কোথাও বলেনি যে এই মহাপ্লাবন পৃথিবীর সর্বত্র হয়েছিল। কুরআন যেহেতু স্পষ্ট করে এটাও উল্লেখ করে না, তাই এই সমালোচনাটাও কুরআনের সাথে যায় না।

কিন্তু কোনো কোনো তাফসীরকারক বলেছেন যে এই মহাপ্লাবন পৃথিবীর সর্বত্র হয়েছে।[১] অর্থাৎ এই মহাপ্লাবনে পুরো পৃথিবীই তলিয়ে গিয়েছিল। এখন যদি ধরেও নিই যে সেই মহাপ্লাবনে পুরো পৃথিবী তলিয়ে গিয়েছিল, তাতেও কোনো সমস্যা নেই। কারণ, কুরআন তো নির্দিষ্ট করে বলছে না যে অমুক সালে নূহের প্লাবন হয়েছে। যেহেতু কুরআন সেটা বলছে না, তাই হতে পারে এই মহাপ্লাবন এমন সময়ে হয়েছিল, যখন সভ্যতা আর অবশিষ্ট থাকেনি। বাইবেলের টাইম ফ্রেম ধরে আগালে বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদির সাথে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিচ্ছে, কুরআনের বর্ণনায় সেটা নেই। কারণ, কুরআন নির্দিষ্ট সময়ের কথা উল্লেখ করেনি।

সুতরাং,

১) বাইবেলের টাইম ফ্রেম দিয়ে কুরআনকে বিচার করাটা অযৌক্তিক।

২) কুরআন স্পষ্ট উল্লেখ করে না যে এই মহাপ্লাবন পৃথিবীর সর্বত্র হয়েছিল।

৩) যদি হয়েও থাকে, তাতেও কোনো সমস্যা নেই। কারণ, কুরআন নির্দিষ্ট টাইম পিরিয়ডের কথা উল্লেখ করেনি। হতে পারে এটা মিলিয়ন বা বিলিয়ন বছর আগের ঘটনা।

এবং আল্লাহই সর্বজ্ঞাত।

আরজ আলী সাহেবরা করেছেন কী, ধর্মের নামে প্রচলিত নানান রকম কুসংস্কার, বিভিন্ন ধর্মে প্রচলিত নানান রীতি-নীতিকে ইসলাম এবং দীনে ইসলাম ভেবে সমালোচনায় নেমে পড়েছিলেন। আফসোস! তারা এমন কোনো কিছু বা এমন কারও কাছে যায় না, যারা সত্য ইসলাম জানে এবং সঠিক ইসলাম মানে।

---

১ তাফসীর ইবনে কাছির

বিবিধ

'বিবিধ' অংশটি আরজ আলী মাতুব্বর সাহেবের সত্যের সন্ধান বইয়ের সর্বশেষ অধ্যায়। এই অধ্যায়ে মাতুব্বর সাহেব প্রথম যে প্রশ্নটি করেছেন, সেটি নিয়ে লিখতে গেলে ভলিউমের পর ভলিউম বই লেখা যাবে, কিন্তু শেষ হবে না। অংশটির নাম—'বিবর্তনবাদ'। বলা হয়, আধুনিক বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় ধোঁকা এবং প্রতারণার নাম হলো 'বিবর্তনবাদ'। তিনি লিখেছেন, 'আদম কী আদিমানব?'

আদম (আ.) আদিমানব কি না এই প্রশ্নের ব্যাখ্যায় তিনি জীববিজ্ঞানীদের কথা উল্লেখ করেছেন। জীবাশ্মবিদদের কথা উল্লেখ করেছেন। পৃথিবীর প্রথম প্রাণী কখন এল, কীভাবে এল ইত্যাদি আলোচনা নিয়ে হাজির হয়েছেন। উনি বলেছেন, জীবতত্ত্ববিদদের মতে, জীবসৃষ্টির শুরুতে অতিক্ষুদ্র এক কোষবিশিষ্ট জীব 'অ্যামিবা' থেকে ক্রমবিবর্তন ও ক্রমবিবর্ধনের ফলে প্রথমে ব্যাক্টেরিয়া, সেখান থেকে স্পঞ্জ, মৎস, সরীসৃপ, পশু ইত্যাদি বহু জীবে রূপান্তরিত হয়ে শেষে 'বন মানুষ' তথা Anthorpoidape এবং তাদের ক্রমোন্নতির ফলে বর্তমান সভ্য মানুষ এসেছে আজ থেকে প্রায় ত্রিশ হাজার বছর পূর্বে।

বিবর্তনবাদের আলোচনায় যাওয়ার আগে কিছু খুচরা আলাপ সেরে নেওয়া জরুরি মনে করছি।

বিবর্তনবাদীরা, বিশেষ করে বিবর্তনবাদকে যারা 'সৃষ্টিতত্ত্বের' বিপরীতে দাঁড় করাতে চায়, তারা 'বিবর্তনবাদ' শব্দটাকে এমনভাবে বলে, যেন এটা একেবারে গাছ থেকে আপেল পড়ার মতো সত্য কোনো জিনিস।

'বিবর্তন' শব্দটা অন্য দশটি শব্দের মতো খুব সাধারণ একটি শব্দ। ধর্ম বলতে যেমন যেকোনো ধর্মকে বোঝাতে পারে, প্রাণী বলতে যেমন যেকোনো প্রাণীকে বোঝাতে পারে, মানুষ বলতে যেমন পৃথিবীর যেকোনো ধর্মের, যেকোনো গোত্রের, যেকোনো বর্ণের মানুষকে বোঝাতে পারে, ঠিক তেমনই 'বিবর্তন' বলতেও সব ধরনের 'বিবর্তন'কে বোঝাতে পারে। এখন যে কেউ প্রশ্ন করতে পারে, বিবর্তন কত প্রকারের হতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য আপনাকে আগে 'বিবর্তন' শব্দের অর্থটা ভালোভাবে বুঝতে হবে। বিবর্তন বলতে আসলে কী বোঝায়?

'বিবর্তন' অর্থ পরিবর্তন বা ক্রমবিকাশ। অর্থাৎ, এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় উত্তরণ হওয়াকেই মূলত বিবর্তন বলা হয়। এই 'বিবর্তন' শব্দটাকে বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা যায়। এর অর্থ নির্ভর করছে আপনি আসলে এই শব্দটাকে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছেন এর ওপর। যেমন : শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনের ফলে মাতৃগর্ভে একটি পূর্ণাঙ্গ মানব ভ্রূণের জন্ম, ক্ষুদ্র একটি বীজ থেকে একটি মহিরুহ বৃক্ষের আবির্ভাব, ইট-বালি-সিমেন্ট ইত্যাদির মিশেলের ফলে দৃষ্টিনন্দন দালানকোঠা ইত্যাদি তৈরিকে আপনি বিবর্তন বলতে পারেন। কারণ, এখানে বিভিন্ন উপাদানের মিশেলের ফলে এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় উত্তরণ ঘটছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এ সমস্ত বিবর্তন একদম দিনের মতোই সত্য। এসবের ব্যাপারে কারও কোনো প্রশ্ন নেই, আপত্তি নেই। কেউ কখনো এসবের পক্ষে প্রমাণও দেখতে চায় না।

অন্যদিকে চার্লস ডারউইন প্রস্তাবিত বিবর্তনবাদ তত্ত্ব (Theory OF Evolution) হচ্ছে এমন একটি তত্ত্ব, যেখানে 'বিবর্তন' অর্থ হলো বিলিয়ন বিলিয়ন বছর আগে, একটি মাত্র অণুজীব থেকে এলোমেলো পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ধাপে ধাপে পুরো প্রাণিজগৎ এবং উদ্ভিদজগৎ বিবর্তিত হয়েছে।

একটিমাত্র এককোষী অণুজীব থেকে এলোমেলো পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে পুরো উদ্ভিদজগৎ এবং প্রাণিজগতের বিবর্তন এবং ওপরে আলোচ্য বিবর্তন কখনোই এক নয়। ওপরের আলোচ্য বিবর্তনের পক্ষে কোনো প্রমাণাদির দরকার পড়ে না, অন্যদিকে ডারউইন প্রস্তাবিত বিবর্তনের পক্ষে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারে, বিবর্তনবাদের পক্ষে কোনো প্রমাণ না থাকলে পৃথিবীর এতগুলো বিজ্ঞানী তাহলে বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করে কেন? তারা কি বিজ্ঞান বোঝেন না? তারা কি ঘাস খান?

জি। আবারও জোরালোভাবে দাবি করছি, বিবর্তনবাদের পক্ষে বিবর্তনবাদীরা কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ হাজির করতে পারে না। তারা আজ পর্যন্ত যে সমস্ত পরোক্ষ প্রমাণ আমাদের সামনে বা মিডিয়ার সামনে হাজির করেছে, তাও গোঁজামিল এবং কপটতায় ভরপুর। মিসিং লিঙ্ক (Missing Link), জাঙ্ক ডিএনএ (Junk DNA) সহ বিভিন্ন ইস্যুতে তাদের ভণ্ডামি বার বার আমাদের সামনে এসেছে। তবুও বীরদর্পে বিবর্তনবাদ বিজ্ঞানমহলে টিকে আছে। কেন টিকে আছে সেটা জানতে হলে আপনাকে এর পেছনের পলিটিক্সটা জানতে হবে। বস্তুবাদকে পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করার একমাত্র মোক্ষম অস্ত্র এই 'বিবর্তনবাদ'। ধর্মগুলো মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা, অনন্য হিসেবে দাবি করে থাকে। ধর্মের দাবি, পৃথিবীর সমস্ত কিছু মানুষের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। আর, এই পৃথিবীই মানুষের জন্য শেষ সময় নয়। পৃথিবীর পাঠ চুকিয়ে তাকে চলে যেতে হবে অনন্ত, অসীম এক সময়ের অধীনে। অন্য একটি জগতে। সেমেটিক ধর্মগুলোর মতে, এটি হলো পারলৌকিক জগৎ। সেই জগতে তার পাপ-পুণ্যের হিসাব দিতে হবে।

কিন্তু বস্তুবাদ তথা ডারউইনবাদ যা ধারণা দেয়, তা থেকে বোঝা যায় যে, মানুষ আসলে বিশেষ কোনো সৃষ্টি নয়। সে একটি ক্ষুদ্র এককোষী ব্যাকটেরিয়া থেকে সময়ের সাথে সাথে বিবর্তিত হতে হতে আজকের আধুনিক মানুষ বা উন্নত পশুমাত্র। এই বস্তুবাদের আরও ধারণা হলো এই যে, পরকাল বলতে আসলে কিছু নেই। এই পৃথিবীই শেষ। এরপরে আর কোনো জীবন বা সময় নেই।

এই বস্তুবাদকে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, প্রতিটি স্তরে পৌঁছে দিতে হলে বিবর্তনবাদই হতে পারে এখানে মোক্ষম অস্ত্র। এ জন্য বস্তুবাদের দখলে থাকা বিজ্ঞানীমহল এবং তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন চক্র খুব সুকৌশলে পাঠ্যবইয়ে, ম্যাগাজিন, পত্রিকায় বিবর্তনবাদকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছে, যেন এটা একেবারে গাছ থেকে আপেল পড়ার মতোই সত্য। উল্লেখ্য, বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন দেখিয়েছেন যে গাছ থেকে আপেল ভূমিতে পড়ছে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্য। পুনঃপুন পরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা তার সত্যতা প্রত্যক্ষ করেছে। প্রতিদিন শত শত মানুষ প্রত্যক্ষ করছে যে গাছ থেকে আপেল সব সময় ভূমিতেই পড়ছে, ওপরের দিকে উঠছে না। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো বিজ্ঞানী দেখাতে পারেননি যে চোখের সামনে এক ধরনের শারীরিক গঠনবিশিষ্ট প্রাণী আরেক ধরনের গঠনে বিবর্তিত হয়েছে।

অথচ যখনই কোনো বিজ্ঞানী, গবেষক এই বিবর্তনবাদের সমালোচনা করেন, ঠিক তখনই সেই বিজ্ঞানী, গবেষক হয়ে পড়েন অন্ধবিশ্বাসী, ক্রিয়েশনিস্ট, গোঁড়া, মূর্খ ইত্যাদি। মোদ্দাকথা, বিবর্তনবাদের সমালোচনা করলে তাকে আর বিজ্ঞানীমহলে কোনোরকম পাত্তা দেওয়া হয় না। তিনি যত বড় বিজ্ঞানীই হোক, তাঁর যত গবেষণা-কাজ থাকুক না কেন, তাকে বিজ্ঞানমহলে তখন 'আবর্জনা' জ্ঞান করা হয়। বিবর্তনবাদ বিরোধীদের সাথে বস্তুবাদী বিজ্ঞানমহল কী রকম আচরণ করে, সেটা নিয়ে একটা বিখ্যাত ডকুমেন্টারি করা হয়েছিল একবার। ইউটিউবে 'Expelled: No intelligence allowed' লিখে সার্চ দিলেই সেই ডকুমেন্টারি দেখতে পাবেন।

পশ্চিমা দেশগুলোতে পদোন্নতি পেতে হলে, প্রাতিষ্ঠানিক সম্মান পেতে হলে এবং বিজ্ঞান-সাময়িকীতে লেখা ছাপাতে হলে বেশকিছু নিয়ম-নীতিমালার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি নিয়ম হলো, চোখমুখ বন্ধ করে বিবর্তনবাদকে বিশ্বাস করে নেওয়া। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত জীবাশ্মবিদ গুনটার বেকলির সাথে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ প্রণিধানযোগ্য। তিনি জার্মানির স্টাটগার্ডে অবস্থিত স্টেট মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রি-তে কিউরেটর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। গুনটার বেকলি ছিলেন ফসিল ড্রাগনফ্লাই-এর বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। তিনি অনেকগুলো ফসিল ড্রাগনফ্লাই প্রজাতি আবিষ্কার করেন এবং তার নামে একাধিক প্রজাতির নামকরণও করা হয়েছে। তিনি ছিলেন বিবর্তনবাদী এবং উক্ত মিউজিয়ামে বিবর্তনবাদ সম্পর্কে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু গত কয়েক বছর তিনি তার পড়ালেখার আলোকে বিবর্তনবাদের কথিত প্রমাণাদির ওপর সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করেন এবং শেষ পর্যন্ত এ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছান যে, এলোপাতাড়ি বিবর্তনের প্রস্তাবিত কোনো পদ্ধতিই প্রজাতির বিবর্তন প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়। প্রথম প্রথম তিনি তার সিদ্ধান্তের বিষয়টি গোপন রাখলেও গত বছর তা প্রকাশ করেন। যার ফল, তাকে মিউজিয়ামের কিউরেটর পদ থেকে কোনো উপযুক্ত কারণ প্রদর্শন না করেই অপসারণ করা হয়। উইকিপিডিয়ার মতো তথাকথিত নিরপেক্ষ অনলাইন বিশ্বকোষ থেকে তার পেইজটিকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করা, যেন জীবাশ্মবিদ্যায় তার কোনো অবদানই নেই।[১]

একজন বিজ্ঞানী বিবর্তনবাদ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করলেও সেটা প্রকাশ করতে পারেন না তার সম্মান, মর্যাদা ইত্যাদি হারানোর ভয়ে। বলা চলে, অনেকটা জোর

১ https://evolutionnews.org/2017/10/wikipedia-erases-paleontologist-gunter-bechly/

করে বিবর্তনবাদ বিশ্বাস করানো হয়।

আমেরিকান অণুজীব বিজ্ঞানী জোনাথন ওয়েলস ২০০০ সালে প্রকাশিত উনার বই *Icons OF Evolution* এ লিখেছেন,

"গোঁড়া ডারউইনবাদীরা প্রথমে ডারউইনবাদের সংকীর্ণ ব্যাখ্যা চাপিয়ে দিয়ে ঘোষণা করে বসে যে বিজ্ঞানচর্চার এটাই একমাত্র রাস্তা। তখন সমালোচনাকারীরা হয়ে পড়ে অবৈজ্ঞানিক। সমালোচকদের নিবন্ধসমূহ গোঁড়াবাদী বিজ্ঞান-সাময়িকীগুলো প্রত্যাখ্যান করে। সরকারি সংস্থাগুলো সমালোচকদের অর্থায়নে অস্বীকৃতি জানায়। সবশেষে সমালোচককে বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় থেকে বহিষ্কার করা হয়। এভাবেই, ডারউইনবাদী মতবাদের বিপক্ষে সকল প্রমাণ আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে যায়, যেভাবে পুলিশ বাহিনীর বিপক্ষে সাক্ষী অদৃশ্য হয়ে যায়। অথবা প্রমাণগুলোকে কবরস্থ করা হয় বিশেষায়িত প্রকাশনাগুলোতে, যার সন্ধান পান কেবল অতি কৌতূহলোদ্দীপক গবেষকরাই। আর যখনই সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং প্রমাণগুলো গায়েব করে দেওয়া যায়, ঠিক তখনই ডারউইনবাদীরা প্রচার করে বেড়ায় যে, বিবর্তনবাদের বিপক্ষে বৈজ্ঞানিক বিতর্ক আছে, কিন্তু কোনো প্রমাণ মজুদ নেই।[১]"

এই হচ্ছে বিজ্ঞানমহলকে টুঁটি চেপে ধরা বস্তুবাদীদের ভেতরের খবর। এভাবেই তারা চায় দুনিয়া থেকে ধর্ম উঠে যাক। স্রষ্টাতত্ত্বকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিতে পারলেই তারা তাদের 'ভোগবাদী' দুনিয়ার নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হবে। আর এই কাজে তাদের একমাত্র তুরুপের তাস হলো, বিবর্তনবাদ।

সালটা ১৮৩২। ইংল্যান্ড থেকে ছেড়ে যায় H.M.S Beagle নামের একটি জাহাজ। জাহাজে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর যাত্রী। কেউ সাগর ভ্রমণ করবে। মিতালি গড়ে তুলবে দুমড়ে পড়া প্রতিটা ঢেউয়ের সাথে। কেউ উপভোগ করবে প্রকৃতির নিশ্চুপ নৈসর্গিকতা। জাহাজের পাটাতনে শুয়ে কেউ-বা সখ্য গড়ে তুলবে রাতের আকাশের সাথে। এ রকম বিভিন্ন জনের বিভিন্ন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে যাত্রা করে এই জাহাজ। সেই জাহাজে একজন তরুণ লোক ছিল। চেহারায় কাঠিন্যের কোনো ভাব নেই। প্রকৃতি তার বেশ পছন্দের। প্রকৃতির টানে সেও ছুটে এসেছিল সেদিন। লোকটার

---

১ Icons Of Evolution: 235-236

নাম চার্লস ডারউইন। শখের বিষয় প্রকৃতি হলেও ভদ্রলোককে পড়তে হচ্ছিল প্রাণিবিজ্ঞান। অনেকটা বাধ্য হয়েই পড়া যাকে বলে।

এভাবে জাহাজে জাহাজে কেটে গেল পাঁচ পাঁচটা বছর। বিভিন্ন দ্বীপ, অঞ্চলে গিয়ে জাহাজ নোঙর করত, আর সবাই হুড়মুড় করে নেমে সেই দ্বীপ-অঞ্চলে বিচরণে ব্যস্ত হয়ে পড়ত। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে বিভিন্ন প্রাণীদের বিভিন্ন গঠন, বিভিন্ন প্রজাতি দেখে অবাক হয় চার্লস ডারউইন। বিশেষ করে, গ্যালাপাগাস নামের এক দ্বীপে এক ধরনের ছোট ছোট পাখি দেখে খুবই আশ্চর্য হয়ে পড়েন। এই পাখিগুলোর ঠোঁটের ভিন্নতা দেখে তিনি মনে করলেন, পাখিগুলোর বাসস্থানের অভিযোজনের ফলে তাদের ঠোঁটে এ রকম ভিন্নতা এসেছে। অর্থাৎ প্রতিকূল পরিবেশের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে নিতে সময়ের পরিক্রমায় এসব পাখিদের ঠোঁটে ভিন্নতা চলে এসেছে।

এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে তিনি মত দিলেন যে, প্রকৃতিতে প্রাণের ও বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর উৎপত্তি ঘটেছে এ রকম অভিযোজনের ফলে। চার্লস ডারউইন এটাকে ‘প্রাকৃতিক নির্বাচন’ বলে উল্লেখ করেছেন।

চার্লস ডারউইনের মতে, প্রকৃতিতে একটি অবিরাম সংগ্রাম চলছে। সেটা হলো টিকে থাকার সংগ্রাম। এই টিকে থাকার সংগ্রামে যেসব প্রাণীরা নিজেদের প্রতিকূল পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, তারা টিকে থাকে এবং যারা এই সংগ্রামে টিকতে ব্যর্থ হয়, তারা বিলুপ্ত হয়ে যায়। এখন প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার এই সংগ্রামে অভিযোজনের ফলে তাদের মধ্যে নানা রকম বৈশিষ্ট্য যোগ-বিয়োগ হয়। এভাবে, একসময় একটা প্রাণী ভিন্ন একটা প্রজাতির প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়। সংক্ষেপে এটাই হলো ‘প্রাকৃতিক নির্বাচন’।

একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আরও সহজে বোঝা যাবে। ধরুন একটি জঙ্গলে দশটি হরিণ আছে এবং একটি বাঘ আছে। এখন ওই এলাকায় যদি নতুন করে আরও দুটি বাঘের আগমন ঘটে, তাহলে হরিণগুলোর জন্য পরিবেশটা প্রতিকূল হয়ে উঠবে। এখন এ রকম প্রতিকূল পরিবেশে কেবল সেইসব হরিণগুলোই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে, যেগুলো বেশি দৌড়াতে পারবে। যেগুলো কম দৌড়াতে পারবে, সেগুলো বাঘের পেটে চলে যাবে।

ঘটনা সত্য। কিন্তু ডারউইন বলেছেন, এই ঘটনা যদি চলমান থাকে, একটা সময়ে

হরিণগুলো প্রতিকূল পরিবেশের সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে খাওয়াতে ভিন্ন একটা প্রজাতিতে রূপান্তরিত হবে।

মজার ব্যাপার হলো, এ রকম প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে কোনোভাবেই এক প্রজাতি থেকে ভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর উদ্ভব সম্ভব নয়। এটা যে সম্ভব নয়, সে কথা হাল আমলের বিবর্তনবাদীরাই এখন অকপটে স্বীকার করে নিয়েছে। অর্থাৎ প্রাকৃতিক নির্বাচন কোনোভাবেই নতুন প্রজাতি সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু চার্লস ডারউইন মনে করতেন, প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলেই প্রকৃতিতে এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতির উদ্ভব ঘটে। তিনি নিজের বইয়ের নামকরণটাই করেছিলেন, Origin Of Species by means of natural selection।

তবে চার্লস ডারউইনই এই ধরনের তত্ত্বের প্রথম প্রবক্তা নয়। তার আগে এই ধরনের একটি প্রকল্প (Hypothesis) দিয়েছিলেন ফ্রেঞ্চ জীববিজ্ঞানী লামার্ক। লামার্কের মতে, একটি প্রাণী তার অর্জিত বৈশিষ্ট্যগুলো পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে পৌঁছে দেয়। এভাবেই আস্তে আস্তে একটা প্রাণী ভিন্ন একটা প্রাণীতে বিবর্তিত হয়। উদাহরণ হিসেবে তারা জিরাফের কথা বলে। তাদের মতে হরিণজাতীয় একপ্রকার প্রাণী প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে গলা উঁচিয়ে উঁচু থেকে উঁচুতর ডাল থেকে পাতা খেতে খেতে একসময় তাদের গলা লম্বা হয় এবং এভাবে তারা ভিন্ন একটা প্রজাতিতে বিবর্তিত হয়। এভাবেই জিরাফের আবির্ভাব বলে প্রচার করা হয়। কিন্তু আধুনিক জিনতত্ত্ববিদ্যার গবেষণার মাধ্যমে বিংশ শতাব্দীতে এর পক্ষে কোনো প্রমাণ না পাওয়ায় লামার্কিজম পরিত্যক্ত হয়। একবিংশ শতাব্দীতে এসে এপিজেনেটিক্স-এর আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে একটি প্রজাতি তার কিছু অর্জিত বৈশিষ্ট্য পরবর্তী প্রজন্মে পৌঁছে দিতে পারে। এই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে Eva Joblanka এবং Massimo Pigliucci লামার্কিজম পুনর্জীবিত করার চেষ্টা করছেন নিও-লামার্কিজম নামে। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে, পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটি হয় প্রজাতির গাঠনিক তথ্যের কোনো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে পারে না অথবা যে পরিবর্তন আনে তা পরবর্তী অল্প কয়েক প্রজন্ম পর্যন্ত পৌঁছে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। অর্থাৎ নিও-লামার্কিজমও প্রজাতিতে নতুন বৈশিষ্ট্যের আগমন ব্যাখ্যা করতে পারে না।[১]

---

১ Stephen Meyer, Darwin's Doubt; 2013; Harper Collins Publishers, p. 331

প্রাকৃতিক নির্বাচন যেকোনোভাবেই নতুন প্রজাতি সৃষ্টি করে না, সেটা অকপটে স্বীকার করে British Museum of natural history এর একজন সিনিয়র জীবাশ্মবিদ, যিনি নিজেই একজন বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী, Colin Patterson বলেছিলেন,

'প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে কেউ কখনো নতুন প্রজাতি উদ্ভব করতে পারেনি। কেউ কখনো এটার ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারেনি। নব্য ডারউইনবাদের বেশির ভাগ আলোচনাই এ সম্পর্কে।[১]'

বিবর্তনবাদীরা তাদের বিবর্তনবাদের বইগুলোতে, 'প্রাকৃতিক নির্বাচন'কে জায়েজ করতে একটি ঘটনা বর্ণনা করে থাকে। এই ঘটনা প্রথম বর্ণনা করেন বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানী Douglas Futuyma, ১৯৮৬ সালে লেখা উনার The Biology Of Evolution বইতে। এই ঘটনা 'Industrial Melanis' নামে পরিচিত।

তিনি লেখেন, ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের শুরুর দিকে, ম্যানচেস্টারের আশপাশের গাছগুলোর বাকলের রং বেশ হালকা বা ফিকে ধরনের ছিল। বাকলের রং ফিকে হওয়ার ফলে কালচে বর্ণের মথগুলো (একধরনের পোকা) সহজে ধরা পড়ত এবং পাখিদের শিকারে পরিণত হতো। কিন্তু পঞ্চাশ বছর পরে, দূষণের কারণে ভূইফোঁড় বা একজাতীয় ছত্রাক নিঃশেষ হয়ে গেলে ফিকে হওয়া গাছের বাকলের রং আস্তে আস্তে কালচে বর্ণ ধারণ করে। বাকলের রং কালচে হয়ে যাওয়ার ফলে কালচে রঙের মথগুলো আর সহজে ধরা পড়ে না। কিন্তু এবার পাখিদের শিকারে পরিণত হতে শুরু করল ফিকে বা হালকা রঙের মথগুলো। যেহেতু দূষণের কারণে গাছের বাকলের রং পরিবর্তন হয়ে কালচে হয়ে গেল, সেহেতু ফিকে ধরনের মথগুলো সহজেই ধরা পড়তে লাগল।

তো বিবর্তনবাদীরা মনে করে, এই ঘটনা তাদের বিবর্তনবাদের পক্ষে বিশাল বড় একটি প্রমাণ। তারা খুব আনন্দের সাথে এই ঘটনা মানুষকে বলে বেড়ায়। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, এই ঘটনা কোনোভাবেই বিবর্তনবাদের পক্ষে প্রমাণ নয়। এই ঘটনা কি প্রমাণ করে যে মথগুলো বিবর্তিত হয়ে ভিন্ন কোনো প্রজাতির উদ্ভব ঘটিয়েছে? না। বরং কালচে এবং ফিকে রঙের মথ যেমন শিল্প বিপ্লবের পূর্বেও ছিল, তেমনই শিল্প বিপ্লবের পরেও তাদের অস্তিত্ব ছিল। দূষণের কারণে কেবল

১ Colin Patterson, "Cladistics", Interview with Brian Leek, Peter Franz, March 4, 1982, BBC

তাদের সংখ্যার পরিবর্তন ঘটেছে মাত্র। এটা কোনোভাবেই বিবর্তনবাদ বা প্রাকৃতিক নির্বাচনের পক্ষে প্রমাণ হতে পারে না।

যদি মথগুলোর নতুন অঙ্গা-প্রত্যঙ্গা গজাত, তাদের জিনে নতুন তথ্য যোগ হতো, কেবল তখনই এটা বিবর্তনবাদের পক্ষে প্রমাণ বলে চালানো যেত। কিন্তু বিবর্তনবাদীরা এই ঘটনাকে বিবর্তনবাদ এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের পক্ষে জোরালো প্রমাণ হিসেবে চালায়। সাধারণ মানুষকে দিন-দুপুরে তারা ঘোল খাওয়ানোর চেষ্টা করে।

তাহলে দেখা গেলো, ডারউইন প্রস্তাবিত পদ্ধতি 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' প্রজাতিতে নতুন ও সম্পূর্ণ ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের আগমন ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ। অর্থাৎ ভুল প্রমাণিত হলো। প্রাকৃতিক নির্বাচন যেকোনোভাবেই নতুন প্রজাতি উদ্ভব করতে পারে না, সেটা প্রমাণিত হবার পরেই তো বিবর্তনবাদ তত্ত্বের তল্পি-তল্পাসহ জাদুঘরে চলে যাবার কথা। কিন্তু না। বিবর্তনবাদের প্রাথমিক প্রস্তাবনা ভুল প্রমাণিত হবার পরেও বিবর্তনবাদ বহাল তবিয়তেই বিজ্ঞানমহলে বর্তমান। কিন্তু কেন? ওই যে, বস্তুবাদ। বস্তুবাদকে বাঁচাতে হলে বিবর্তনবাদের চেয়ে ভালো কোনো 'দাবার চাল' আর কিছু নেই। সে জন্য যেভাবেই হোক, এই বিবর্তনবাদকে বাঁচাতেই হবে। নাস্তিক জিনতত্ত্ববিদ Richard C. Lewontin-এর ভাষায়,

"বিজ্ঞান ও অতিপ্রকৃতির মাঝে আসল দ্বন্দ্বকে বোঝার চাবি হল কমনসেন্সবিরোধী বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মেনে নিতে আমাদের সদিচ্ছার দিকে তাকনো। যদিও বিজ্ঞানের কিছু মতবাদ সুস্পষ্টভাবে হাস্যকর, যদিও এটি জীবন ও স্বাস্থ্যের উন্নয়নের ব্যাপারে নানা উচ্চাভিলাষী প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ব্যর্থ হয়, যদিও বৈজ্ঞানিক মহল অপ্রমাণযোগ্য কেবলই (শিশুতোষ) গল্প (যেমন প্রাকৃতিক নির্বাচনের কিছু বিষয়) মেনে নিতে সহিষ্ণু-তবুও আমরা বিজ্ঞানের পক্ষ নেই। কারণ আমরা আগে থেকেই বস্তুবাদের নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ব্যাপারটা এমন নয় যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানগুলো বিস্ময়কর জগৎ সম্পর্কে একটি বস্তুবাদী ব্যাখ্যা গ্রহণে কোনো না কোনোভাবে আমাদের বাধ্য করে। বরং, পক্ষান্তরে (বস্তুবাদের প্রতি) পূর্ব থেকেই আনুগত্যের কারণে আমরা বাধ্য হই (জগৎ অনুসন্ধানের) এমন উপকরণ ও কিছু ধারণা তৈরীতে যা বস্তুবাদী ব্যাখ্যাই জন্ম দেয়। সে ব্যাখ্যা যতই কাণ্ডজ্ঞানহীন হোক না কেন, অনভিজ্ঞদের জন্য যতই দুর্বোধ্য হোক না কেন। উপরন্তু, বস্তুবাদই হল অকাট্য কারণ আমরা (আমাদের চিন্তার) দরজায় ঐশ্বরিক পদক্ষেপকে অনুমোদন করতে পারি না।[১]"

---

১ রাফান আহমেদ, বিশ্বাসের যৌক্তিকতা, পৃষ্ঠা : ৫১

এ কারণে, বিবর্তনবাদকে বাঁচাতে পরে বিবর্তনবাদীরা আরও নতুন নতুন কিছু ফর্মুলা পেশ করেছে। এ রকম কয়েকটি ফর্মুলাগুলো নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

'প্রাকৃতিক নির্বাচন' পদ্ধতির অসারতা এবং বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব কল্যাণে DNA, RNA-এর আবিষ্কার, মলিকুলার লেভেলে ব্যাপক অগ্রগতির ফলে ডারউইনের 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' পদ্ধতি যখন অসহায় হয়ে ওঠে, তখন বিবর্তনবাদকে বাঁচাতে মরিয়া হয়ে ওঠে বিবর্তনবাদীরা। বিবর্তনবাদকে কীভাবে রক্ষা করা যায় এ ব্যাপারে তারা শলাপরামর্শের আয়োজন করে। ১৯৪১ সালে Geological Society Of America কর্তৃক আয়োজিত এক সভায় বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীরা একত্র হলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন Ernst Myar, Julian Huxley, George Gaylord Simpson, Glenn L. Jepsen, Ronald Fisher, Sewall Right সহ প্রমুখ। উদ্দেশ্য ছিল, বিবর্তনবাদকে মেরামত করা।

তারা সবাই মিলে নতুন একটি পদ্ধতি দাঁড় করালেন। তারা প্রাকৃতিক নির্বাচনকে তো পাশে রাখলেনই, সাথে বললেন Random Mutation তথা এলোমেলো পরিবর্তনের ফলে একটি প্রাণীর জিনে নতুন নতুন তথ্য যোগ হয়। এসব নতুন নতুন তথ্যকে তারা নাম দিয়েছে 'Advantageous Mutation' বা 'লাভজনক পরিবর্তন'। অর্থাৎ প্রাণীর জিনে (Gene) মিউটেশনের ফলে নতুন নতুন তথ্য যোগ হওয়ার ফলে একসময় দেখা যায় যে, ওই প্রাণীর মধ্যে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য চলে আসে। তখন সেই প্রাণীটা অন্য নতুন কোনো প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়।

আরেকটু ক্লিয়ার করি। ধরুন, একটি পাখি। এই পাখির জিনে পাখিটার ওড়ার, খাওয়ার, তাকানোর সব রকম জেনেটিক তথ্য আছে। পাখিটা সে মতেই উড়ে, খায়, দেখে। এখন যদি পাখিটার জিনে মিউটেশন (পরিবর্তন) ঘটে, তাহলে সেই পাখিটার জিনোমে তথ্যের পরিবর্তন ঘটবে। দেখা যাবে পাখিটার মধ্যে জলচর কোনো প্রাণীর বৈশিষ্ট্য যোগ হয়ে গেছে। ফলে পাখিটা তখন পাখি থেকে জলচর কোনো প্রাণীতে পরিণত হবে। মোটামুটি বিবর্তনবাদীদের প্রস্তাবিত Random Mutation বা এলোমেলো পরিবর্তনের এটাই সারমর্ম। এটাকে বলা হয়, The Modern synthetic Evolution Theory। আর এটার প্রবক্তাদের বলা হয় Neo-Darwinist।

কিন্তু, তাদের প্রস্তাবিত সেই Random Mutation বা এলোমেলো পরিবর্তনের পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। এ যাবৎকালে গবেষণালব্ধ সকল তথ্য-উপাত্ত এটাই প্রমাণ করে যে, লাভজনক মিউটেশান বা Advantageous Mutation বলতে কিছু আসলে নেই। মিউটেশান কখনোই লাভজনক হয় না। প্রাণীর জিনে মিউটেশান ঘটলে তা কখনোই কোনো উপকার করে না; বরং ক্ষতি করে। মিউটেশনকে একটি দুর্ঘটনার সাথে তুলনা করা যায়। দুর্ঘটনা যেমন কখনোই নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না ধ্বংস ছাড়া, মিউটেশানও ক্ষতি ছাড়া নতুন কোনো কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। ভূমিকম্পের ফলে একটা বিল্ডিং যেভাবে ধসে যায়, মিউটেশানও সে রকম ভাঙার কাজ করে প্রাণীর জিনে। আর এর প্রভাব পড়ে প্রাণীর শরীরে।

এলোমেলো পরিবর্তন কখনোই সুশৃঙ্খল কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। B.G Ranganathan এটাকে উল্লেখ করেছেন এভাবে,

"প্রথমত, খাঁটি মিউটেশন প্রকৃতিতে খুবই বিরল। দ্বিতীয়ত, প্রায় সমস্ত মিউটেশনই ক্ষতিকর, যেহেতু তা জিনের গঠনের সুনিয়ন্ত্রিত পরিবর্তনের এলোমেলো পরিবর্তন। অত্যন্ত সুসজ্জিত কোনো সিস্টেমের মধ্যে এলোমেলো পরিবর্তন ভালো করার পরিবর্তে সব সময় খারাপটাই করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, অত্যন্ত সুবিন্যস্তভাবে তৈরি দালানে যদি ভূমিকম্প আঘাত করে, তাহলে দালানটির কাঠামোতে একটি এলোমেলো পরিবর্তন ঘটে যাবে, যাতে দালানটির উন্নয়ন সাধিত হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই।[১]"

এখন পর্যন্ত উপকারী মিউটেশনের কোনো প্রমাণ কেউ দেখাতে পারেনি। বরং এ কথা বার বার প্রমাণিত হয়েছে যে, সব ধরনের মিউটেশনই ক্ষতিকর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত পারমাণবিক অস্ত্রের বিকিরণে ঘটিত সম্ভাব্য মিউটেশন সম্পর্কে তদন্ত করতে গিয়ে Committee On Genetic Effects of Atomic Radiation একটি রিপোর্ট তৈরি করে। এই রিপোর্ট সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানী Warren Weaver বলেছেন,

---

১ B.G Ranganathan, "Origins?" Pennsylvania: The banner of truth trust, 1988

"অনেকেই এই কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবে যে, বাস্তবে আজ পর্যন্ত জানা মিউটেশনের শিকার সকল জিনই ক্ষতিকর। অথচ মিউটেশন হচ্ছে বিবর্তন প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাহলে মিউটেশনের মাধ্যমে কীভাবে ভালো ফলাফল বা প্রাণী উন্নতর অবস্থা প্রাপ্ত হবে, যখন সকল মিউটেশনই ক্ষতিকর?[১]"

বিগত কয়েক দশক ধরে বিবর্তনবাদীরা 'সফল মিউটেশন' ঘটানোর জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে যাচ্ছে। তারা বছরের পর বছর ধরে গবেষণাগারে মাছির ওপর মিউটেশন চালিয়ে যাচ্ছে। মাছির ওপর মিউটেশন চালানোর কারণ এটাই যে, মাছি খুব দ্রুত বংশ বিস্তার করতে পারে। প্রতি এগারো দিনে মাছি নতুন প্রজন্মের জন্ম দিতে পারে। দীর্ঘ সময় ধরে বিবর্তনবাদীরা মাছির ওপরে মিউটেশনের কাজ চালিয়ে মাছির একটি নতুন প্রজাতি তো দূরের কথা, একটা নতুন এনজাইমও এখন পর্যন্ত তৈরি করে দেখাতে পারেনি।[২]

মাছির ওপর গবেষণা করে মিউটেশনের মাধ্যমে নতুন প্রজাতি সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়ে গবেষক Michel Pitman বলেছেন,

"মরগান, গোল্ডসচিমিডট, মুলারসহ আরও অনেক প্রজনন-শাস্ত্রবিদ মাছির বিভিন্ন প্রজাতির ওপরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। তারা মাছির বিভিন্ন প্রজাতিকে খুব গরম, ঠান্ডা, আলো-অন্ধকার, রাসায়নিক বিকিরণের মধ্যে রেখেছেন। সকল প্রকারের মিউটেশন সংগঠিত হয়েছে, যার সবই বস্তুত ক্ষতিকারক। এটাকে কি মানবসৃষ্ট বিবর্তনের প্রমাণ বলা যাবে? একদম না। উৎপাদিত (মিউটেশনের ফলে বিকৃত) প্রাণীগুলোর অল্পই হয়তো বোতলের বাইরে বেঁচে থাকতে পারবে। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, মিউটেশনের ফলে উৎপাদিত প্রজন্ম মারা যায়, বংশবিস্তারে অক্ষম হয়ে পড়ে অথবা বংশানুক্রমে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়।[৩]"

মাছির মধ্যে মিউটেশনের যে প্রভাব, মানুষের মধ্যেও ঠিক একই রকম প্রভাব দেখা গেছে। মানুষের মধ্যেও আজ পর্যন্ত উপকারী মিউটেশনের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। মানুষের মধ্যে ঘটা মিউটেশনের ফলাফল হিসেবে যা পাওয়া গেছে আজ পর্যন্ত তা হলো, বিকলাঙ্গতা, বৈকল্য বা জন্মগত মানসিক সমস্যা, ডাউন সিনড্রোম (একটি

---

১ Warren Weaver, "Genetics Effects Of Atomic Radiation", Science, Vol- 123, June 29, 1956
২ Gordon R. Taylor, The great evolution mystery, p- 48
৩ Michel Pitman, Adam & Evolution, London: River Publishing, 1984, p- 70

জিনগত রোগ), আলবিনিজম (ধবলজাতীয় রোগবিশেষ), বামনত্ব অথবা ক্যানসার।

মিউটেশনের ফলে মানুষকে এ রকম ভয়াবহ রোগগুলো পেয়ে বসে। কিন্তু এই মিউটেশনকেই বিবর্তনবাদীরা বিবর্তনের পক্ষে প্রমাণ বলে চালিয়ে দেয়। কিন্তু এ কথা বলে নেওয়া জরুরি যে, যা-ই ক্ষতিকর বা ক্ষতির কারণ, তা কখনোই বিবর্তনের পক্ষে প্রমাণ হতে পারে না। কেননা, বিবর্তনের মূল সারমর্মই হলো বেঁচে থাকার উপযুক্ততা লাভ করা। অর্থাৎ বেঁচে থাকার জন্য আগের অবস্থার চেয়ে ভালো অবস্থায় যাওয়া। কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম যে বাস্তবে ঘটনা ভিন্ন। মিউটেশন কখনোই উপকারী কোনো কিছু ঘটাতে পারে না। মিউটেশন যা ঘটায়, তার সবটাই ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং, বিবর্তনবাদীরা নতুন প্রজাতির উদ্ভবের জন্য যে মিউটেশনের কথা বলে, তাও ভুল প্রমাণিত হলো।

এরপর, বিবর্তনবাদীরা যখন বুঝতে পারল যে কথিত ধীর এবং ক্রমবিবর্তন অসম্ভব, এবং ধীর প্রক্রিয়ার মিউটেশন কখনোই নতুন প্রজাতি উদ্ভাবনে সক্ষম নয়, তখন বিবর্তনবাদীরা তাদের বিবর্তনবাদকে আবারও ঢেলে সাজাবার প্রয়োজন অনুভব করল। বিবর্তনবাদকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করতে এবার এগিয়ে আসেন দুই প্রতিথযশা বিজ্ঞানী, আমেরিকান জীবাশ্মবিদ Niles Elredge এবং Stephen Jay Gould। তারা খুব ভালোভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, নব্য ডারউইনবাদীরা যে ধীর এবং ক্রম বিবর্তনের কথা বলে, সেটা আদতে অসম্ভব। তারা ফসিল রেকর্ড ঘেঁটে বুঝতে পারলেন, প্রকৃতিতে প্রাণীর আগমন ধীরগতিতে নয়, বরং আকস্মিকভাবে। অর্থাৎ প্রাণীর জিনে মিউটেশনের ফলে আস্তে আস্তে এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতির উদ্ভবের যে কল্পকাহিনি বিবর্তনবাদীরা আমাদের গেলানোর চেষ্টা করে, সেটা ভুল। তারা মনে করেন, প্রকৃতিতে প্রাণীর আগমন কোনো ধীর প্রক্রিয়ায় নয়, বরং হঠাৎ করেই। এখন যদি হঠাৎ করে প্রাণীর আগমন হয়, তাহলে এতদিন ধরে বিবর্তনবাদীদের আনীত, প্রস্তাবিত সকল প্রস্তাবনাই বাতিল হয়ে যায়। প্রাণীর হঠাৎ আগমনের পেছনে তখন কেবল একটাই যুক্তিযুক্ত, বিজ্ঞানসম্মত উত্তর থাকতে পারে। সেটা হলো, কোনো ডিজাইনারের উপস্থিতি। সেই ডিজাইনার নিঃসন্দেহে স্রষ্টা। কিন্তু বস্তুবাদী বিজ্ঞান আর তার ধারকবাহকেরা যখন হলফ করেই ফেলেছে যে, কোনোভাবেই তারা স্রষ্টাতত্ত্বকে বিজ্ঞানের অন্দরমহলে প্রবেশ করতে দেবে না, তখন কীভাবে তারা প্রাণীর আকস্মিক আগমনের জন্য স্রষ্টাকে স্বীকার করে নেবে?

না। তারা যখন সেবারও ব্যর্থ হলো, তখন তারা নতুন আরও একটি প্রস্তাব নিয়ে হাজির হলো আমাদের সামনে। বিজ্ঞানী Niles Eldredge এবং Stephen Jay Gould কর্তৃক প্রস্তাবিত সেই পদ্ধতির নাম, Punctuated Equilibrium। এই পদ্ধতি আগের Modern Synthetic Evolution Theory থেকে কিছুটা আলাদা। Modern Synthetic Evolution Theory মতে, প্রাণীর জিনে মিউটেশনের ফলে আস্তে আস্তে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ পায়। যেমন : একটি মাছের জিনে কিছু মিউটেশনের ফলে সে আস্তে আস্তে উভচর বা স্থলচর প্রাণীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য লাভ করে। এভাবে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য লাভ করার ফলে, একটা সময় পরে সেটা ভিন্ন একটা প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়।

কিন্তু Punctuated Equilibrium এরচেয়ে একটু আলাদা। তারা প্রাণীর জিনে মিউটেশনের ফলে আস্তে আস্তে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আসার ব্যাপারটাকে স্বীকার করে না। তাদের মতে, প্রাণীর জিনে আকস্মিক বড় ধরনের মিউটেশনের ফলে খুব অল্প সময়ে সম্পূর্ণ নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটে। অর্থাৎ একটি প্রজাতির জিনে অল্প কয়েক প্রজন্মে অসংখ্য 'সুনির্দিষ্ট' মিউটেশন এলোমেলোভাবে হয়। ফলে উক্ত প্রজাতি থেকে স্বল্প সময়ে অনেকগুলো ভিন্ন প্রজাতির আবির্ভাব ঘটে। অতঃপর উক্ত নতুন প্রজাতিগুলো অনেকদিন টিকে থাকে।

অর্থাৎ তাদের দাবি অনুযায়ী, সরীসৃপ থেকে পাখি এসেছে অসংখ্য র‍্যানডম মিউটেশন তথা এলোপাতাড়ি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে, অল্প কয়েক প্রজন্মে। চিন্তা করে দেখুন, মাছি যেহেতু অল্প সময়ে বংশবৃদ্ধি করতে পারে, এই পদ্ধতি অনুযায়ী মাছির একটি প্রজাতিতে মিউটেশন ঘটাতে ঘটাতে অল্প কিছু প্রজন্মেই নতুন পোকার জন্ম নেওয়ার কথা। অথচ মাছির ওপর বছরের বছরের এলোপাতাড়ি মিউটেশন পরীক্ষা চালিয়েও উপকারী কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা যায়নি, নতুন বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রজাতির আগমন তো অনেক পরের বিষয়!

এ যেন ঠিক রূপকথার সেই গল্পের মতো, যেখানে গল্পের ব্যাঙ একদিন হঠাৎ করে রাজকুমারে পরিণত হয়। আসলে বিবর্তনবাদীদের প্রস্তাবিত গল্প আর রূপকথার গল্পের মধ্যে তেমন একটা পার্থক্য নেই। কোনো কোনো জায়গায় তাদের গল্পগুলো রূপকথার গল্পগুলোকেও হার মানায়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সময়ের বিবর্তনে বিবর্তনবাদীদের গল্পগুলোও বিবর্তিত হয়।

তারা আজকে এক পদ্ধতির কথা বলে তো, আগামীকাল আরেক পদ্ধতি। তাদের নিজেদের মধ্যেই তাদের প্রস্তাবিত, আনীত পদ্ধতি নিয়ে ঐকমত্য নেই। তারা যখন দেখে যে আধুনিক বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার, মলিকুলার লেভেলের বিস্ময়কর সব উদ্ভাবন তাদের প্রস্তাবিত গল্পগুলোর বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়, ঠিক তখনই তারা এক পদ্ধতি থেকে আরেক পদ্ধতিতে লাফ দেয়।

জীবাশ্ম রেকর্ড : বিবর্তনবাদীদের অসহায়ত্ব

জীবাশ্ম হলো, একটি বিলুপ্ত জীবের পূর্নাঙ্গ দেহ বা তার অংশবিশেষ, যা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় সংরক্ষিত থেকে যায়। এসব জীবাশ্ম থেকে কোটি কোটি বছর আগে বিলুপ্ত হওয়া বা অস্তিত্বে থাকা বিভিন্ন প্রাণী সম্পর্কে আমরা জানতে পারি।

এখন বিবর্তনবাদীদের তত্ত্ব অনুসারে, প্রাণের বিবর্তন ঘটেছে অত্যন্ত ধীর গতিতে। যেমন : একটা মাছের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আসতে আসতে সেটা একসময় ভিন্ন আরেকটা প্রজাতির প্রাণীতে বিবর্তিত হয়েছে। এখন যদি তা-ই হয়, তাহলে প্রকৃতিতে এ রকম অসংখ্য মিসিং লিঙ্ক মজুদ থাকার কথা যার অর্ধেক মাছ, অর্ধেক অন্য প্রজাতির। রূপকথার গল্পের মৎস্যকন্যার কথা মনে আছে? সেই মৎস্যকন্যাকে একটা উৎকৃষ্ট মিসিং লিঙ্ক হিসেবে কল্পনা করা যায়।

[উল্লেখ্য, কিছু কিছু বিবর্তনবাদীদের দাবি অনুসারে, মাছ থেকেই মানুষের বিবর্তন ঘটেছে। যদি তা-ই হয়, তাহলে মৎস্যকন্যার মতো মিসিং লিঙ্ক থাকা আবশ্যক। যদি মাছ থেকেই মানুষ বিবর্তিত হয়, তাহলে তো আর এক লাফে মাছ মানুষে বিবর্তিত হয়ে যায়নি। বরং মাছে ধীরে ধীরে মানুষের মতো পা গজিয়েছে, হাত গজিয়েছে। এরপর মানুষের মতো চোখ, নাক, কান... এভাবেই সে একটা সময় পরে গিয়ে মানুষ হয়েছে। ঘটনা যদি এটাই হয়, তাহলে এই সময়ের কোনো একপর্যায়ে সেই মাছের মানুষের মতো মাথা আর মাছের মতো লেজ থাকা স্বাভাবিক। সে দৃষ্টিকোণ থেকে মৎস্যকন্যা কোনো রূপকথার চরিত্র নয়; বরং বৈজ্ঞানিক চরিত্র বটে]

এখন বিবর্তনবাদ তত্ত্বকে যদি প্রমাণ করতেই হয়, তাহলে প্রকৃতিতে মৎস্যকন্যার মতো এ রকম অসংখ্য মিসিং লিঙ্ক মজুদ থাকার কথা। কিন্তু বিবর্তনবাদীদের জন্য বড়ই আফসোস এবং পরিতাপের বিষয় এই যে, বিবর্তনবাদীদের দাবি প্রমাণ করে

এমন মিসিং লিঙ্ক প্রকৃতিতে মজুদ নেই।

যদি তাদের দাবি অনুযায়ী, ধীর গতির বিবর্তন হয়েও থাকে, তাহলে প্রকৃতিতে হাজার বা কোটি কোটি নয়, মিলিয়ন মিলিয়ন মিসিং লিঙ্ক মজুদ থাকার কথা। পৃথিবীতে যত প্রজাতির প্রাণী আছে, তারচেয়ে কয়েক কোটি গুণ বেশি হওয়ার কথা মিসিং লিঙ্কের সংখ্যা। কিন্তু আছে কি? নেই।

এই মিসিং লিঙ্ক যে বিবর্তনবাদের জন্য মরণফাঁদ হতে পারে, সেটা স্বয়ং চার্লস ডারউইনও জানত। তাই তিনি তাঁর লেখা Origin Of Species: By means of natural selection বইয়ের 'Difficulties Of the Theory' অধ্যায়ে ব্যাপারটা অকপটে স্বীকার করে বলেছেন,

"আমার তত্ত্ব যদি সত্য হয়, তাহলে সমগোত্রীয় প্রজাতিগুলোর মাঝে সংযোগ রক্ষাকারী অসংখ্য মধ্যবর্তী প্রজাতির (Missing Link) অস্তিত্ব থাকার কথা। এদের অস্তিত্বের প্রমাণ শুধু জীবাশ্মের মাধ্যমেই পাওয়া যেতে পারে।[১]"

একই অধ্যায়ে তিনি আরও লেখেন,

"যদি এক প্রজাতি অন্য প্রজাতি থেকে সুন্দর ক্রমান্বয় অনুসরণ করে বেরিয়ে আসে, তবে কেন আমরা চারদিকে অসংখ্য মধ্যবর্তী প্রজাতির (Missing Link) দেখা পাই না? কেন প্রজাতিসমূহের প্রকৃতি এলোমেলো হওয়ার পরিবর্তে সুগঠিত? তত্ত্বানুসারে যেহেতু অসংখ্য মধ্যবর্তী প্রজাতির অস্তিত্ব থাকার কথা, কেন পৃথিবীর স্তরে স্তরে সেসবের চিহ্ন অবশিষ্ট নেই? এই সমস্যাটি আমাকে খুব ভাবায়।[২]"

ডারউইন মনে করেছিলেন, তার সময়ে বিজ্ঞানের তেমন উন্নতি সাধিত না হওয়ায় পর্যাপ্ত পরিমাণে জীবাশ্মের সন্ধান মেলেনি। তিনি আশাবাদী ছিলেন যে, একটা সময়ে জীবাশ্মগুলোর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে মিসিং লিঙ্কের সন্ধান মিলবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, ডারউইনের মৃত্যুর দেড় শ বছর অতিক্রম করলেও আজ অবধি এমন কোনো মিসিং লিঙ্কের সন্ধান বিবর্তনবাদীরা বের করতে পারেনি, যা তাদের তত্ত্বকে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করে। জীবাশ্ম রেকর্ডে মিসিং লিঙ্কের এই

---

১ Charles Darwin, The Origin Of Species, A Facsmile Of the First Edition, 1964, p- 179
২ Charles Darwin, The Origin Of Species, A Facsmile Of the First Edition, 1964, p- 179

'শূন্যতা' দেখে হতাশ হয়ে বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানী Derek V. Ager বলেছেন,

"আমরা যদি জীবাশ্ম রেকর্ড খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ করে দেখি, তাহলে ঘুরেফিরে যে বিষয়টা সামনে আসে তা হলো : একদলের হঠাৎ বিলুপ্তি ও অন্যদলের বিস্ফোরণ কোনো ধীর বিবর্তনের ফল নয়।[১]"

আরেক বিবর্তনবাদী জীবাশ্মবিদ Mark Czarnecki আরও একধাপ এগিয়ে বলেছেন,

"বিবর্তনবাদ তত্ত্বটি প্রমাণের একটি বড় অসুবিধা হলো এই জীবাশ্ম রেকর্ড। পৃথিবীর পরতে পরতে সংরক্ষিত বিলুপ্ত প্রজাতিসমূহের ছাপ। এই জীবাশ্ম রেকর্ডে কখনোই ডারউইনের প্রস্তাবিত অন্তবর্তীকালীন রূপের দেখা মেলেনি। এর পরিবর্তে আমরা যা পেয়েছি তা হলো, প্রজাতিসমূহ একদম হঠাৎ করেই আগমন করেছে, আবার হঠাৎ করেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর এই জিনিসটাই সৃষ্টিতত্ত্ববাদীদের এই কথা বলতে ইন্ধন জুগিয়েছে যে, প্রত্যেক প্রজাতিই স্রষ্টার সৃষ্টি।[২]"

মিসিং লিঙ্কের এই 'শূন্যতা' বিবর্তনবাদীরাও জানে। কিন্তু সাধারণ মানুষকে তো আর এসব জানানো যাবে না। জানালে তো থলের বিড়াল বেরিয়ে আসবে। এ জন্যই বিবর্তনবাদীরা প্রায়ই কল্পিত মিসিং লিঙ্ক তৈরি করে মানুষকে ধোঁকায় ফেলে। তারা বিভিন্ন মিসিং লিঙ্কের ছবি কম্পিউটারে ফটোশপ করে, এঁকে পাঠ্যবইয়ে এমনভাবে ছাপায়, যেন এটা একেবারে গ্র্যাভিটির মতো সত্য কোনো বিষয়। আদতে বিবর্তনবাদীরা জালিয়াতি, প্রতারণা করে এসব মিসিং লিঙ্ক বানিয়ে মানুষকে ধোঁকা দেয়। তারা তাদের ইচ্ছা এবং কল্পনামাফিক প্রাণীদের নাক, কান, চুল, ইত্যাদি অঙ্কন করে পাঠ্যপুস্তকে ছাপায়। অথচ এসবের কোনোকিছুই জীবাশ্ম রেকর্ডে পাওয়া যায় না। তাহলে ওরা কীভাবে আঁকে? স্রেফ কল্পনা। সেভাবে তারা এক প্রাণীর হাড়, অন্য প্রাণীর নাক, আরেকটা প্রাণীর চোয়াল এনে জোড়াতালি দিয়ে একটা কল্পিত 'মিসিং লিঙ্ক' তৈরি করে এবং বিবর্তনবাদী ও বস্তুবাদী মিডিয়া সেটাকে ফলাও করে প্রচার করে বেড়ায়।

এবার আমরা সে রকম কিছু ইতিহাস জানব, যেখানে বিবর্তনবাদীরা জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েও ধরা খেয়েছে বার বার।

---

১ Derek V. Ager, "The nature of the fossil records", Proceedings of the British Geological Association, Vol-87, 1976

২ Mark Czarnecki, The Revival Of the Creationist Crusade, 1981, p- 133

কিছু ধাপ্পাবাজির গল্প

এক ফোঁটা উল্লুক এবং দুই ফোঁটা ওরাংওটাং মিলে হয় একটি পিল্টডাউন মানব

১৯১২ সালে ইংল্যান্ডের পিল্টডাউন শহরে একটি জীবাশ্ম পাওয়া যায় বলে চারদিকে শোরগোল পড়ে। একটা খনির মধ্যে চোয়ালের কিছু হাড় এবং করোটির কিছু টুকরো পাওয়া যায়। চোয়ালের হাড়টা উল্লুকের মতো হলেও, করোটির টুকরোগুলো মানুষের খুলির মতো। প্রাপ্ত এই নমুনাগুলোর নাম দেওয়া হলো 'Piltdown Man' বা 'পিল্টডাউন মানব'। এই পিল্টডাউন মানবের বয়স দেখানো হলো ৫,০০,০০০ বছর। রাতারাতি এই পিল্টডাউন মানবকে নিয়ে বিবর্তন পাড়ায় হইচই শুরু হয়ে গেল। এটাকে বলা হলো, মানুষ এবং এপের মধ্যকার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এই পিল্টডাউন মানব নিয়ে বিজ্ঞান-সাময়িকীতে লেখা হয় অসংখ্য প্রবন্ধ, অসংখ্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ চলে আসে চারিদিক থেকে। এটাকে উল্লেখ করা হয়েছে বিবর্তনবাদের সবচেয়ে বড় প্রমাণ হিসেবে। এই জীবাশ্মের ওপরে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভের জন্য ৫০০টিরও বেশি থিসিস লেখা হয়েছিল।[১]

১৯২১ সালে ব্রিটিশ মিউজিয়াম পরিদর্শন করতে গিয়ে নৃতত্ত্ববিদ Henry Fairfield Osborn বলেন,

'পিল্টডাউন মানব মানুষের প্রাগৈতিহাসিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার।[২]'

ন্যাশনাল জিওগ্রাফি চ্যানেলসহ নামকরা সব বিজ্ঞান-সাময়িকী, ম্যাগাজিন, পিয়ার রিভিউ জার্নালে দিনরাত এই পিল্টডাউন মানবকে নিয়ে প্রবন্ধ লেখা হতো।

কিন্তু ১৯৪৯ সালে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের জীবাশ্মবিজ্ঞান বিভাগের দায়িত্বরত জীবাশ্মবিদ, Kenneth Oakley ফ্লুরিন পরীক্ষা করলেন। উল্লেখ্য ফ্লুরিন টেস্ট হলো জীবাশ্মের বয়স নির্ণয়ের নতুন পদ্ধতি। Kenneth Oakley যখন পিল্টডাউন মানবের ওপর ফ্লুরিন টেস্ট করলেন, উক্ত টেস্ট শেষে তিনি যা ফলাফল পেলেন তা রীতিমতো চমকে যাবার মতো। উনি দেখতে পেলেন যে, পিল্টডাউন মানবের

---

১ Malcolm Muggeridge", "The end of Chirtendom", Grand Rapids, 1980
২ Stephen Jay Gould, "Smith Woodward's Folly", April-05, 1979

চোয়ালে কোনো ফ্লুরিনই নেই। এতে বোঝা গেল যে, এটি মাত্র কয়েক বছর ধরে মাটির নিচে ছিল। পিল্টডাউন মানবের খুলিতে খুব অল্প পরিমাণে ফ্লুরিন পাওয়া গেল, যা প্রমাণ করে যে এটা মাত্র কয়েক বছর আগেই সমাধিস্থ কোনো খুলি।

প্রমাণ হলো যে, পিল্টডাউন মানবে চোয়াল এবং দাঁতের অংশটা মূলত ওরাংওটাং নামে আলাদা একটা প্রাণীর। এগুলোকে ঘষেমেজে, পুরোনো বানিয়ে জোড়াতালি দিয়ে পিল্টডাউন মানব বলে চালানো হয়েছে।

এরপর Joseph Weiner এর পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণের পরে, ১৯৫৩ সালে পিল্টডাউন মানব নিয়ে জালিয়াতির ব্যাপারটা সকলের সামনে চলে এল। প্রমাণ হলো যে, পিল্টডাউন মানবের মাথার খুলিটি পাঁচ শ বছর আগে মারা যাওয়া একজন মানুষের এবং চোয়াল আর দাঁত সম্প্রতি মারা যাওয়া একটি উল্লুকের। সেগুলোকে ঘষেমেজে, কৃত্রিম উপায়ে পুরোনো একটা আমেজ তৈরি করে[১], জোড়াতালি দিয়ে বানানো হয়েছিল এই পিল্টডাউন মানব। এভাবেই দীর্ঘ চল্লিশ বছর ভুয়া, নকল এবং জালিয়াতিপূর্ণ এই জিনিস বিজ্ঞানমহলে 'বিবর্তনের সবচেয়ে বড় প্রমাণ' হিসেব সংরক্ষিত ছিল। জালিয়াতি ধরা পড়ার পর রাতারাতি সেটাকে ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে সরিয়ে ফেলা হয়।

পিল্টডাউন মানব নিয়ে এ রকম জালিয়াতি দেখে Sir Wilfred Le Gros Clark বলেন, "কৃত্রিম ঘষামাজার চিহ্নগুলো খুব সহজেই নজরে এল। বাস্তবিক অর্থে, এই কৃত্রিম সংযোজনগুলো এতটাই স্পষ্ট ছিল যে, প্রশ্ন করা যেতে পারে, এগুলো এতদিন নজর এড়িয়ে ছিল কীভাবে?[২]"

পাঠক এই হলো বিজ্ঞানমহলে সেসব বিজ্ঞানীদের ভেতরের গল্প, যাদের আমরা চোখমুখ বন্ধ করে বিশ্বাস করে ফেলি। একটা মতবাদকে দাঁড় করানোর জন্য তারা কী পরিমাণ যে অসততার আশ্রয় নিতে পারে, সেটা রীতিমতো অবাক করার মতো। এত গেল এক কাহিনি। এ রকম আরও কাহিনি আছে যা শুনলে আপনার পিলে চমকে উঠবে।

---

১ Kenneth Oakley, William Le Gros Clark & J.S, "Piltdown", Meydan Larousse, Vol- 10, p- 113

২ Stephen Jay Gould, "Smith Woodwords Folly", New Scientist, April-05, 1979

নেব্রাসকা ম্যান : একটি শূকরের দাঁত থেকে একগুচ্ছ গল্প

বিবর্তনবাদীরা তাদের কল্পিত বিবর্তনবাদকে প্রমাণ করার জন্য যেসব জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছে, নেব্রাসকা মানবের ঘটনা তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ১৯২২ সালে American Musuem of Natural History এর পরিচালক Henry Fairfield Osborn দাবি করলেন যে, তিনি স্নেইক ব্রুক (Snake Brook) এর কাছাকাছি অঞ্চলে, পশ্চিম নেব্রাসকায় প্লাইওসিন যুগের মাড়ির একটি দাঁত পেয়েছেন। আরও দাবি করা হলো, এই দাঁতে নাকি মানুষ এবং উল্লুক উভয়ের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ব্যস, এই দাঁতটির নাম দেওয়া হলো নেব্রাসকা মানব। কেউ কেউ দাবি করল এটা আসলে পিথেক্যানথ্রোপাস ইরেক্টাস, আবার কেউ কেউ দাবি করল এটা আসলে মানুষের নিকটবর্তী কোনো প্রজাতির। রাতারাতি এই 'নেব্রাসকা মানব' এর বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া হলো Hesperopithecusharoldcooki।

এই একটিমাত্র দাঁতের ওপর ভিত্তি করে বিবর্তনবাদীরা নেব্রাসকা মানবের পুরো একটি দেহ এঁকে ফেলল রাতারাতি। শুধু কি নেব্রাসকা মানবের দেহ? ওই একটি দাঁতের ওপর ভিত্তি করে তারা নেব্রাসকা মানবের স্ত্রী, সন্তানসহ পুরো পরিবারের চিত্র এবং এই নেব্রাসকা মানব যে পরিবেশে বেঁচে ছিল, সেই পরিবেশের ছবি পর্যন্ত এরা এঁকে ফেলল। চিন্তা করে দেখুন এদের কল্পনাশক্তি কত প্রখর। একটিমাত্র দাঁত থেকে তারা পুরো বংশতালিকা বের করে ফেলেছে। সাধারণ বোধসম্পন্ন যে কারও কাছে এটাকে রূপকথার গল্প বলে মনে হলেও, বিজ্ঞানের ঠিকাদারদের কাছে এটাই 'বিশুদ্ধ' বিজ্ঞান বলে পরিচিত।

সে যাই হোক, বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীরা Osborn সাহেবের এই কল্পিত চিত্রকর্মকে খাঁটি বিজ্ঞান বলে স্বীকৃতি দিয়ে দিলেন। বিবর্তনবাদ মহলে তখন খুশির আমেজ। এতদিন পর মিলেছে পরম আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর সন্ধান। কিন্তু William Bryan নামের একজন গবেষক বেঁকে বসলেন। একটিমাত্র দাঁতের ওপর ভিত্তি করে পুরো বংশতালিকা প্রণয়ন এবং বিবর্তনবাদীদের চিত্রকর্মে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। জোর দাবি জানালেন যে, এটা নিয়ে এখনই চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্তে যাওয়া ঠিক হবে না। এটা নিয়ে আরও গবেষণা করা উচিত। কিন্তু কে শোনে কার কথা? বিবর্তনবাদীদের কি আর সে সময় আছে? তারা উল্টো William Bryan সাহেবকে নানাদিক থেকে সমালোচনার তিরে বিদ্ধ করতে লাগল।

মজার ব্যাপার হলো, এর কিছু বছর পরে, অর্থাৎ ১৯২৭ সালে ওই দাঁতটি যে প্রাণীর ছিল, গবেষকরা সেটার পুরো কঙ্কালটাই খুঁজে বের করতে সমর্থ হয়। কঙ্কালটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেল, এটা না মানুষ ছিলো, না উল্লুক। বরং, এই দাঁতটি ছিল আমেরিকার বিলুপ্ত হওয়া একপ্রকার শূকরের।

বিবর্তনবাদীরা একটি শূকরের দাঁতকে জালিয়াতি করে মানুষ এবং এর মধ্যবর্তী প্রজাতির বলে ঘোল খাইয়েছিল। পরে যখন প্রমাণ হয় যে এটা আসলে শূকরের দাঁত, তখন তারা তড়িঘড়ি করে তাদের বিবর্তনবাদের সব সাইট থেকে এই নেব্রাসকা মানবের ইতিহাস নামিয়ে ফেলল। বিজ্ঞানী William Gregory এই ঘটনার ওপরে Science ম্যাগাজিনে নিবন্ধ লিখেছিলেন 'Hesperopithecus: Not an Ape not a Man' শিরোনামে।[১]

ওটা বেঙ্গা : খাঁচার ভেতর অচিন মানুষ

উহু, বিবর্তনবাদী জালিয়াতি কিন্তু এখানেই থেমে যায়নি। চার্লস ডারউইন মনে করতেন, একধরনের উল্লুকের মতো প্রাণী থেকেই আধুনিক মানুষের উৎপত্তি হয়েছে। তিনি তাঁর The Descent Of Man বইতে এমনটাই দাবি করেছিলেন। ডারউইনের এই কল্পনানির্ভর চিন্তা অনেক বিবর্তনবাদীদের মনে দাগ কাটে। তারা ভাবল, যেহেতু উল্লুকজাতীয় কোনো প্রাণী থেকেই আধুনিক মানুষের উৎপত্তি, সেহেতু এখনো তাহলে পৃথিবীতে কিছু 'অর্ধেক উল্লুক অর্ধেক মানুষ' জাতীয় প্রাণীর সন্ধান মিলতে পারে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা 'উল্লুক মানুষ' খোঁজার মিশনে নেমে পড়ে। ১৯০৪ সালে একজন বিবর্তনবাদী আফ্রিকার কঙ্গো থেকে 'ওটা বেঙ্গা' নামের একজন পিগমি (পিগমি হলো আফ্রিকা মহাদেশের অধিবাসীদের একটি দল। এরা খুব বেঁটে ধরনের হয়ে থাকে। এ জন্য এদের সাধারণ মানুষদের চেয়ে খানিকটা ভিন্ন মনে হয়) সম্প্রদায়ের লোককে ধরে আনা হয়। দাবি করা হয় এই ওটা বেঙ্গা নাকি উল্লুক এবং মানুষের মধ্যবর্তী কোনো প্রজাতি। তাকে বিবর্তনবাদীরা শিকল দিয়ে বেঁধে আমেরিকায় নিয়ে আসে। St. Louis World Fair নামক মেলায় তাকে অন্যান্য উল্লুকের সাথে মানুষ এবং উল্লুকের মধ্যবর্তী রূপ

---

১ W.K Gregory, "Hesperopithecus: Apparently Not an Ape not a Man", Science, Vol-66, December 1927

হিসেবে প্রদর্শন করা হয়। দুই বছর পরে তাকে নিউইয়র্কের ব্রংক্স চিড়িয়াখানাতে প্রদর্শন করা হয় মানুষের প্রাচীন পূর্বপুরুষ হিসেবে। চিড়িয়াখানায় ওটা বেঙ্গাকে রাখা হয় কিছু শিম্পাঞ্জি, ডাইনাহ নামের একটি গরিলা ও ডোহাং নামের একটি ওরাংওটাংয়ের সাথে। তার সাথে এমন আচরণ করা হয় যেন সে একটি পশু। বেচারা এই অপমান সহ্য করতে না পেরে পরে আত্মহত্যা করে বসে। খবর পাওয়া যায়, তার এক স্ত্রী এবং দুই সন্তান ছিল।[১]

এভাবে বিবর্তনবাদীদের জালিয়াতির সাক্ষী হতে গিয়ে প্রাণ হারায় 'পিগমি' সম্প্রদায়ের এই মানুষটিকে। অপরাধ হলো শারীরিকভাবে সে একটু বেঁটে।

জোড়াতালির জোয়ার

১৯৭২ সালে কেনিয়ার রুডলফে কিছু টুকরো জীবাশ্ম পাওয়া যায়। এগুলোর নাম হয় Homo Rudolfensis। এই জীবাশ্ম আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী রিচার্ড লেকি। তিনি এই জীবাশ্মের খুলির নাম দেন 'KNM-ER-1470'। রিচার্ড লেকির মতে, এই জীবাশ্মের বয়স আটাশ লক্ষ বছর এবং এটি নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার। রিচার্ড লেকির মন্তব্যকে অনেক নৃতত্ত্ববিদ সমর্থন করে বললেন, এই হোমো রুডলোফিনসিসের সাথে হোমো হ্যাবিলিসের কোনো পার্থক্য নেই।

রিচার্ড লেকির দাবি ছিল, এই হোমো রুডলোফিনসিসের করোটির আকৃতি অস্ট্রোলোফিথেসাইনের মতো এবং এর মুখের আকৃতি আধুনিক মানুষের মতো। ব্যস! রিচার্ড লেকি সিদ্ধান্ত দিয়ে বসলেন যে, এই হোমো রুডলোফিনসিস মানুষ এবং অস্ট্রোলোফিথেসাইনের মধ্যকার প্রজাতি।

কিন্তু ১৯৯২ সালে কম্পিউটার সিমুলেশনের মাধ্যমে বিজ্ঞানী Tim Bromage হোমো রুডলোফিনসিসের ওপর গবেষণা করে প্রমাণ করেন যে, রিচার্ড লেকি হোমো রুডলোফিনসিসের যে খুলির নাম 'KNM-ER-1470' রেখেছিলেন, সেই খুলিটি আসলে জোড়াতালি দিয়ে লাগানো।[২] খুলিটি মূলত একটি মানুষের। বিজ্ঞানী J.E Cronin, মিশিগান ইউনিভার্সিটির C. Loring Brace এবং জন হপকিন্স

---

১ Philips Verner Bradford, Harvey Blume, "Ota Benga: The Pigmy In the Zoo", New York, Delta Books 1992

২ Tim Bromage, New Scientist, Vol- 133, 1992, p- 38-41

ইউনিভার্সিটির Alan Walker সহ প্রথম সারির সকল নৃতত্ত্ববিদরা একমত হলেন যে, এই 'KNM-ER-1470' আসলে মানুষ এবং অস্ট্রোলোফিথেইসাইনের মধ্যবর্তী কোনো প্রজাতি নয়; বরং এটি অস্ট্রোলোফিথেসাইন গ্রুপেরই সদস্য।[১]

এরপর, যেসব বিবর্তনবাদী সাময়িকী, মিডিয়া এই জীবাশ্মটিকে বিবর্তনবাদের প্রমাণ বলে পোস্টার টানিয়েছিল, তারা সকলে রাতারাতি তাদের পোস্টার নামিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

Ida–তাদের মোনালিসার উত্থান–পতন

২০০৯ সাল। বিবর্তনবাদ মহলে ঈদের আমেজ। তাদের মতে, তারা তাদের বিবর্তনবাদকে সত্য প্রমাণ করার জন্য সবচেয়ে বড় হাতিয়ারটি পেয়ে গেছে। কী নাম সেটার? সেটার নাম হলো Ida । Ida নামের একটি ফসিলকে বিবর্তনবাদীরা তাদের তত্ত্বটির পক্ষে ইতিহাস-বিখ্যাত প্রমাণ বলে চালাতে লাগল। কেউ কেউ এটাকে বলল, 'The eighth wonder of the world'। আবার কেউ কেউ এটাকে 'Our Monalisa' খেতাবও দিয়ে ফেলেছে ততক্ষণে। তারা জোর গলায় বলতে লাগল, 'আজ থেকে কেউ যদি দাবি করে যে বিবর্তনবাদের পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই, তাহলে তারা যেন Ida প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করে।'

ন্যাশনাল জিওগ্রাফি, হিস্ট্রি, ডিসকোভারিসহ সব বিবর্তনবাদী মিডিয়ায় দিনরাত ফলাও করে প্রচার করা হলো তথাকথিত মিসিং লিঙ্ক Ida'র খবর।

কিন্তু মাত্র তিন বছর পরেই, ২০১০ সালে বিবর্তনবাদীদের কান্নার জলে ভাসিয়ে টেক্সাস ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো এবং ডিউক ইউনিভার্সিটির গবেষকরা মিলে প্রমাণ করে দেখালেন যে আসলে কোনো মিসিং লিঙ্ক নয়; বরং এটি Lamour নামক একটি প্রাণীর ফসিলমাত্র।[২]

ব্যস! সাথে সাথে বিবর্তনবাদ দুনিয়া থেকে Ida'র সব রকম চিহ্ন মুছে ফেলা হলো। এত বড় জালিয়াতির পরেও তারা তাদের কল্পিত তত্ত্ব থেকে কোনোভাবে বিশ্বাস হারালো না। এ রকম জালিয়াতি, কপটতা, অসততার পরেও বীরদর্পে বিবর্তনবাদ বিজ্ঞানীমহলে কেন টিকে আছে পাঠক নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝে ফেলেছেন।

---

১ Allan Walker, Scientific American, Vol- 239 (2), 1978, p- 54

২ Missing Link? Ida wasn't even a close relative say fossil experts, Daily Mail, October 22, 2009

মানুষের বংশতালিকার ব্যবচ্ছেদ

এবার আমরা দেখে নেব বিবর্তনবাদীদের দাবিকৃত বংশতালিকার ঘাপলাটি। উল্লেখ্য, আরজ আলী মাতুব্বর সাহেব জীবাশ্মবিদ এবং জীববিজ্ঞানীদের দোহাই দিয়ে আধুনিক মানুষকে ত্রিশ হাজার বছর পূর্বের এবং মনুষ্য প্রজাতিটিকে লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বের বলে বিবর্তনের একটি প্রাথমিক প্রস্তাবনাকে সত্য হিসেবে ধরে নিয়েছেন। যদিও তিনি বিস্তারিত কোনো আলোচনা করেননি এ বিষয়ে।

বিবর্তনবাদীদের দাবি অনুসারে, চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে, একপ্রকার উল্লুকজাতীয় প্রাণী থেকে আধুনিক মানুষের বিবর্তন শুরু হয়। সেই ক্রম অনুসারে, বিবর্তনবাদীরা মানুষের বংশতালিকাটিকে মৌলিক চার ভাগে ভাগ করে। সেগুলো হলো :

১। অস্ট্রোলোফিথেসাইন
২। হোমো হাবিলিস
৩। হোমো ইরেক্টাস
৪। হোমো স্যাপিয়েনস বা আজকের আধুনিক মানুষ।

অর্থাৎ বিবর্তনবাদীদের দাবি অনুসারে, আজ থেকে চল্লিশ বা পঞ্চাশ হাজার বছর আগে, অস্ট্রোলোফিথেসাইন নামক একপ্রকার উল্লুকজাতীয় প্রাণী থেকেই মানুষের বিবর্তন শুরু হয়। সে অনুসারে, অস্ট্রোলোফিথেসাইনের মাঝে হালকা কিছু মানুষের বৈশিষ্ট্য প্রথম দেখা যায়। অস্ট্রোলোফিথেসাইন থেকেই মানুষের বিবর্তন সূত্রপাত ধরে নিলেও, তারা অস্ট্রোলোফিথেসাইনকে হোমো (মানুষ) ক্যাটাগরিতে ফেলল না। তাদের দাবি, অস্ট্রোলোফিথেসাইন উল্লুক শ্রেণির হলেও এরা মানুষের মতো দুই পায়ে হাঁটত যা সাধারণ উল্লুক পারে না। তারা মনে করে, দুই পায়ে হাঁটতে পারাটাই অস্ট্রোলোফিথেসাইনের মানুষে বিবর্তিত হবার প্রথম পদক্ষেপ। এ জন্য, তারা তাদের বংশতালিকার একেবারে সামনে রাখে এই অস্ট্রোলোফিথেসাইনকে। এরপর সেই অস্ট্রোলোফিথেসাইন থেকে যেসব প্রজাতি বের হয়েছে, তাদের সবাইকে তারা 'হোমো' ক্যাটাগরিতে ফেলল। যেমন : হোমো হাবিলিস, হোমো ইরেক্টাস। প্রথমে দেখে নেওয়া যাক অস্ট্রোলোফিথেসাইন কি আসলেই দুই পায়ে হাঁটত কি না।

অস্ট্রোলোফিথেসাইন যে দুই পায়ে হাঁটত, এই দাবি প্রথম উত্থাপন করে Richard Leakey এবং Donald C. Johanson। কিন্তু এরপরে ইংল্যান্ড ও আমেরিকার দুজন বিশ্ববিখ্যাত জীবদেহ বিশেষজ্ঞ Solly Zuckerman ⊠ Prof. Charles Oxnard অস্ট্রোলোফিথেসাইনের বিভিন্ন প্রজাতির ওপর ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন যে, অস্ট্রোলোফিথেসাইন কখনোই মানুষের মতো সোজা হয়ে হাঁটত না।

একজন বিবর্তনবাদী হয়েও, Solly Zuckerman (Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York, Toplinger Publications, P- 75-94) এবং পাঁচ সদস্যের একটি গবেষকদল ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় পনেরো বছর ধরে অস্ট্রোলোফিথেসাইনের হাড়ের ওপর দীর্ঘ গবেষণা পরিচালনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, অস্ট্রোলোফিথেসাইনরা কখনোই দুই পায়ে হাঁটত না এবং তাদের বৈশিষ্ট্যের আর সাধারণ উল্লুকদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোনো ফারাক নেই।

এবং এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ একজন বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানী, Charles E. Oxnard অকপটে স্বীকার করেছেন যে- অস্ট্রোলোফিথেসাইনরা দুই পায়ে হাঁটতো না। বরং তাদের গঠন বর্তমানের ওরাংওটাং প্রাণীর মতোই।[১]

তাহলে বিবর্তনবাদীরা যে অস্ট্রোলোফিথেসাইনকে 'দুই পায়ে হাঁটার বৈশিষ্ট্য'-এর জন্য মানুষের পূর্বপ্রজাতি বলে দাবি করে, সেই দাবিটা মিথ্যা, ভুল।

কিন্তু আসল প্রশ্ন হলো, উল্লুকজাতীয় প্রাণী থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের আবির্ভাব প্রমাণের জন্য কতগুলো বিভিন্ন আকৃতির কঙ্কাল বা ক্রমান্বয়ে বড় আকৃতির করোটি দেখিয়ে দেয়াই কি যথেষ্ট? কেউ যদি একটি উল্লুক এবং একজন মানুষের ছবি সামনে রেখে কিছুক্ষণ চিন্তা করে সে পার্থক্যের একটি বড় তালিকা তৈরি করে ফেলতে পারবে। যেমন : চার পায়ের পরিবর্তে দুটি পা, হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি, হাতের আকৃতি, লেজের অনুপস্থিতি, গায়ের পশম, ত্বকের রং, মাথার আকার, কথা বলার যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি অনেকগুলো পার্থক্যে মানুষ বিশেষায়িত। অন্যদিকে আমরা জানি, একটি প্রজাতির সবগুলো অঙ্গ পারস্পরিক সমন্বয়সাধনের

---

১ Charles E. Oxnard, "THe Place of Australopithecines: Ground For Doubts", Nature, Volume-258, P- 389

মাধ্যমে কাজ করে। সে হিসেবে একটি প্রজাতিকে অন্য প্রজাতিতে পরিণত হতে হলে অনেকগুলো অঙ্গে একই সঙ্গে পরিবর্তন আসতে হবে। কোনো একটি অঙ্গে পরিবর্তন হলে, অন্য একাধিক অঙ্গে আনুষঙ্গিক পরিবর্তন যদি না আসে তাহলে উক্ত প্রজাতিটি বেঁচে থাকার সংগ্রামে টিকে থাকতে পারবে না।

উদাহরণস্বরূপ, আমরা যদি একটি হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি কথাই চিন্তা করি—একটি উল্লুকজাতীয় প্রাণীর বৃদ্ধাঙ্গুলিকে থেকে মানুষের হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে পরিবর্তিত হতে হলে কবজির সাথে বৃদ্ধাঙ্গুলির সন্ধিতে (জয়েন্ট) পরিবর্তন আসতে হবে, হাড়ের উচ্চতায় পরিবর্তন আসতে হবে, বৃদ্ধাঙ্গুলির সাথে সংশ্লিষ্ট মাংসপেশির সংখ্যা ও সংযোগস্থলে পরিবর্তন আসতে হবে, সংশ্লিষ্ট স্নায়ু ও রক্তনালিতে পরিবর্তন আসতে হবে এবং মস্তিষ্কের যেই অংশ হাতের নিয়ন্ত্রণ করে সে অংশে পরিবর্তন আসতে হবে। অর্থাৎ শুধু বৃদ্ধাঙ্গুলির জন্যই মানবশরীরের তিনটি পৃথক তন্ত্রে সুনির্দিষ্ট ও যুগ্ম পরিবর্তন আসতে হবে। সুতরাং যখন ওপরে উল্লেখিত অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলোকে বিবেচনা আনা হবে তখন উল্লুকজাতীয় প্রাণী থেকে মানুষের বিবর্তনের গল্পটি রূপকথাকেও ছাড়িয়ে যায়।

এছাড়াও প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় মানুষের মতো চিন্তাভাবনার ক্ষমতাসম্পন্ন মস্তিষ্কের কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, বেঁচে থাকার সংগ্রামের জন্য দরকার অধিক প্রজননক্ষমতা। অথচ মানুষের উন্নত মস্তিষ্ক এমন একটি অঙ্গ যা খাদ্য উপাদান থেকে সংগৃহীত শক্তির একটা বড় অংশ খেয়ে ফেলে। যার ফল হলো, প্রজননক্ষমতার ব্যবহার কমে যাওয়া। অর্থাৎ বেঁচে থাকার সংগ্রামে উন্নত চিন্তাশক্তিসম্পন্ন মস্তিষ্ক কোনো 'সারভাইভাল বেনিফিট' দেয় না। সুতরাং বিবর্তনবাদ মানুষের উন্নত মস্তিষ্কের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারে না। এটা আমাদের কথা না। স্বয়ং বিবর্তনবাদীরাই এ কথা বলছেন। ডিএনএ-এর গঠন আবিষ্কারকদের একজন, বিবর্তনবাদী নাস্তিক ফ্রান্সিস ক্রিক বলেন,

"সর্বোপরী আমাদের অত্যন্ত বিকশিত মস্তিষ্ক বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারের জন্য বিবর্তিত হয়নি; বরং কেবলেই বেঁচে থাকা ও বংশধর রেখে যাওয়ার জন্য আমাদের যথেষ্ট দক্ষ করে তুলতে বিবর্তিত হয়েছে।[১]"

---

১ বিশ্বাসের যৌক্তিকতা, রাফান আহমেদ, পৃষ্ঠা নং : ৪১

অস্ট্রোলোফিথেসাইনের পরে এল হোমো হাবিলিসের পালা। অস্ট্রোলোফিথেসাইনের পরের ধাপ হলো গিয়ে হোমো ইরেক্টাস। এখন অস্ট্রোলোফিথেসাইন থেকে সরাসরি হোমো ইরেক্টাসে লাফ দেওয়া কিন্তু সম্ভব না। কারণ, অস্ট্রোলোফিথেসাইন 'হোমো' অর্থাৎ মানুষের ক্যাটাগরির না। এখন উল্লুকশ্রেণির একটি প্রাণী ধপাস করেই যে হোমো ক্যাটাগরির কোনো প্রাণীতে লাফ দেবে, এটা স্বয়ং বিবর্তনেরই নীতিবিরুদ্ধ। তাহলে কী করা যায়? সমাধান হলো মাঝখানে নতুন কোনো গল্প ফাঁদা। মাঝখানের সেই গল্পটির নামই হলো 'দ্য স্টোরি অফ হোমো হাবিলিস'।

১৯৬০ সালের দিকেই প্রথম হোমো হাবিলিসের ধারণা প্রবর্তন করা হলো। বলা হলো, এদের করোটির আকৃতি আপেক্ষিকভাবে বড়, এরা সোজা হয়ে হাঁটতে পারত এবং এরা কাঠের সরঞ্জামাদি ব্যবহার করত। এ জন্যই এরা মানুষের পূর্বপুরুষ।

কিন্তু ১৯৮০ সালের দিকে নতুন জীবাশ্ম আবিষ্কার হওয়ার পরে এই ধারণা সম্পূর্ণভাবে পাল্টে গেলো। Bernard Wood এবং C. Loring Brace এর মতো গবেষকরা নতুন জীবাশ্মগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানালেন, হোমো হাবিলিসকে আসলে 'হোমো হাবিলিস' না বলে 'অস্ট্রোলোফিকেথাস হাবিলিস' বলা উচিত। অর্থাৎ এটাকে মানুষের ক্যাটাগরিতে না ফেলে বরং উল্লুকের ক্যাটাগরিতে ফেলাই অধিক যুক্তিযুক্ত এবং পরীক্ষিত। অস্ট্রোলোফিথেসাইন প্রজাতির উল্লুকের সাথে ছিল এদের প্রচুর মিল। এদের লম্বা হাত, খাট পা, উল্লুকের মতো কঙ্কালের গঠন—সবকিছুই অস্ট্রোলোফিথেসাইন প্রজাতির সাথেই মিল। এবং এদের হাত এবং পায়ের আঙুল ছিল গাছে চড়ার উপযোগী। এদের করোটির ধারণক্ষমতা ছিল ৬০০ ঘন সেন্টিমিটার। এদের ছিল উল্লুকের মতোই চোয়াল। মোদ্দাকথা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গবেষকরা বললেন, হোমো হাবিলিস আসলে হোমো ক্যাটাগরির কিছু না। এটা অস্ট্রোলোফিথেসাইন ক্যাটাগরির উল্লুক।

১৯৯৪ সালে Holly Smith নিখুঁত গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, হোমো হাবিলিস আসলে হোমোই না; বরং এটা অস্ট্রোলোফিথেসাইন জাতের উল্লুক। অস্ট্রোলোফিথেসাইন, হোমো হাবিলিস, হোমো ইরেক্টাস এবং হোমো নিয়ান্ডারথালেনসিসের দাঁতের ওপরে গবেষণা করে তিনি বলেন,

"দাঁতের ওপরে বিস্তারিত গবেষণা এটাই প্রমাণ করে যে, অস্ট্রোলোফিথেসাইন এবং হোমো হাবিলিস আফ্রিকান উল্লুকশ্রেণির।[১]"

তাহলে এটাও স্পষ্ট যে, হোমো হাবিলিস আদতে 'হোমো' ক্যাটাগরির কোনো প্রাণী নয়; বরং এটি উল্লুকশ্রেণিরই প্রাণীবিশেষ।

এরপর বিবর্তনবাদী গল্পগুলো সরাসরি 'হোমো' ক্যাটাগরিতে ঢুকে পড়ে। পরের গল্পগুলো তারা এভাবে সাজায় : হোমো ইরেক্টাস-হোমো স্যাপিয়েনস এবং নিয়ান্ডারথাল মানব-হোমো স্যাপিয়েনস স্যাপিয়েনস। এই প্রজাতিগুলোর বৈশিষ্ট্যে সামান্য বৈসাদৃশ্যের কারণে বিবর্তনবাদী গোষ্ঠী এগুলোকে একেকটা আলাদা আলাদা শ্রেণিতে ফেলে দেয়। আদতে এরা সবাই মানুষ ছিল। এরা ছিল মানবপ্রজাতির ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠী। আফ্রিকান একটি জনগোষ্ঠীর সাথে ইউরোপের একটি জনগোষ্ঠীর যে পার্থক্য, একজন পিগমি শ্রেণির মানুষের সাথে একজন রেড ইন্ডিয়ান শ্রেণির যে পার্থক্য, এখানেও পার্থক্যগুলো ঠিক সে রকম। তাই বলে একজন পিগমি সম্প্রদায়ের লোককে ইউরোপের একটি জনগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ বা পূর্বপ্রজাতি বলা কতটুকু সমীচীন?

যেমন : হোমো ইরেক্টাসের কথাই ধরুন। 'হোমো ইরেক্টাস' শব্দের অর্থ হলো 'খাড়া হয়ে হাঁটা মানুষ'। বিবর্তনবাদীরা এই হোমো ইরেক্টাসকে অন্যান্য জীবাশ্ম থেকে আলাদা করেছে একটিমাত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে। সেটা হলো এটার খাড়া হয়ে হাঁটতে পারার বৈশিষ্ট্য।

মূলত যে মৌলিক কারণ দেখিয়ে বিবর্তনবাদীরা হোমো ইরেক্টাসকে 'আদিম মানব' বানিয়ে দেয়, তা হলো এটার করোটির ধারণক্ষমতা এবং বাইরের দিকে বের হয়ে আসা ভ্রূণ।

হোমো ইরেক্টাসের করোটির ধারণক্ষমতা ৯০০-১১০০ সিসি যা আধুনিক মানুষের করোটির ধারণক্ষমতার চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম।

কিন্তু কেবল করোটির ধারণক্ষমতার স্বল্পতা এবং বাইরের দিকে বের হয়ে আসা ভ্রূণের

---

১ Charles E. Oxnard, The place of Australopithecines in human evolution: Ground for Doubts. Nature, Volume-258, P-389

ভিত্তিতে একটি জীবাশ্মকে 'আদিম' রূপ বলে চালিয়ে দেওয়া আদৌ কি ন্যায়সংগত?

হোমো ইরেক্টাসের সমান খুলিবিশিষ্ট মানুষ তো বর্তমানেও আছে। যেমন : আফ্রিকার পিগমি সম্প্রদায়। এদের করোটির ধারণক্ষমতা সাধারণ মানুষের তুলনায় গড়পড়তা হারে কম। আবার বাইরের দিকে বের হয়ে আসা ভ্রূণসমৃদ্ধ মানুষও আজকাল ঢের দেখা যায়। যেমন : অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয় অধিবাসী। এদের ভ্রূণ বাইরের দিকে বের হওয়া। এখন এই অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের কারণে আমরা কি বলব যে আফ্রিকার পিগমি এবং অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসীরা মানুষের পূর্বপ্রজাতি? আদিম মানব?

আরও মজার ব্যাপার, বিবর্তনবাদীরা মনে করে, করোটির ধারণক্ষমতার ওপর মানুষের বুদ্ধিমত্তা নির্ভর করে। হোমো ইরেক্টাসের করোটি যেহেতু তুলনামূলক ছোট, এ জন্য বিবর্তনবাদীরা অনুমান করে নিয়েছে যে, তাহলে হোমো ইরেক্টাস প্রজাতি বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়েও মনে হয় আধুনিক মানুষের চেয়ে পিছিয়ে।

অথচ আজকের আধুনিক বিজ্ঞান এ কথা অকপটে স্বীকার করে নিয়েছে যে, করোটির ধারণক্ষমতা বা আয়তনের ওপরে বুদ্ধিমত্তা নির্ভর করে না। বুদ্ধিমত্তা নির্ভর করে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরীণ গঠনের ওপর।[১]

বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানী Richard Leakey বলেছেন,

"আলাদা আলাদা মানবসম্প্রদায়ের পার্থক্যের মতোই হোমো ইরেক্টাস আর আধুনিক মানুষেরমাঝেপার্থক্য"।[২]

অথচ এ কথা সকলেই জানি যে, আলাদা আলাদা শারীরিক গঠন মূলত লম্বা সময় ধরে ভৌগোলিক দূরত্বে অবস্থানের কারণে হয়ে থাকে।[৩]

এখন এই ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে কিছু শারীরিক বৈসাদৃশ্যের কারণে একটা সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা সম্প্রদায়ের বলে চালানো কতটুকু বৈজ্ঞানিক?

হোমো ইরেক্টাসের অস্তিত্ব নিয়ে ২০০০ সালে বিজ্ঞানীদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

---

১ Marvin Lubenow, Bones of connection, Grands Rapids, Baker 1992, P-83

২ Richard Leakey, The making of Mankind

৩ Richard Leakey, The making of Mankind, P-62

হয়। Senckenberg সম্মেলনের সেই বিতর্কের বিষয় ছিল হোমো ইরেক্টাস বলে কোনো শ্রেণি আছে কি না। তর্কাতর্কির পরে সেই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত ছিল এই যে, প্রজাতি হিসেবে হোমো ইরেক্টাস বলে আসলে কিছু ছিল না। প্রজাতি হিসেবে বিশ লক্ষ বছর থেকে বিস্তৃত একমাত্র প্রজাতি হোমো স্যাপিয়েনসেরই অন্তর্ভুক্ত।[১]

কিন্তু যত যা-ই বলুন আর দেখান না কেন, বিবর্তনবাদী গোঁড়া সম্প্রদায় তাদের মত এবং কল্পনাপ্রসূত ধারণার মধ্যে অনড় থাকবে। বিচার মানবে কিন্তু তালগাছ তাদের।

আমরা দেখতে পেলাম যে বিবর্তনবাদী দৃশ্যপটের প্রত্যেক পরতে পরতে লুকিয়ে আছে ধাপ্পাবাজি আর জালিয়াতির গল্প। এই গল্পগুলো কেউ তুলির আঁচড়ে আঁকে, কেউ জোড়াতালি লাগায় এবং কেউ মিডিয়া এবং পাঠ্যপুস্তকে মুখরোচক করে উপস্থাপন করে।

বস্তুবাদীদের করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পেতে হলে মানুষের উচিত বিজ্ঞানকে ‘দেবতার’ আসন থেকে সরিয়ে দেওয়া। বস্তুবাদীরা ধর্মহীন পৃথিবী গড়ার যে মিশন নিয়ে নেমেছে, বিবর্তনবাদ সেই মিশনের অন্যতম একটি হাতিয়ার। এই বস্তুবাদীদের হাত থেকে বিজ্ঞান এবং ধর্মকে বাঁচাতে হলে চাই আসল বিজ্ঞানের চর্চা।

আরজ আলী মাতুব্বর যেমন কোনো তথ্য-উপাত্ত ছাড়াই একচেটিয়াভাবে মানুষকে ত্রিশ হাজার বছর আগের বলে চালিয়ে দিয়ে ‘বিবর্তন তত্ত্ব’কে গাছ থেকে আপেল পড়ার মতো সত্য হিসেবে ধরে নিয়ে আদম (আ.) কে আদি মানবের লিস্ট থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন, ঠিক সে রকম বিবর্তনবাদী দুনিয়াও বিজ্ঞানকে অপব্যাখ্যা, বিকৃত এবং অর্ধসত্য জিনিসকে প্রচার করে তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বিবর্তনবাদ আসলে স্বল্প আলোচনার কোনো বিষয় নয়। তবুও স্বল্প আলোচনার মধ্যে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, বিবর্তনবাদীদের বলে বেড়ানো, প্রচার করা তথ্যগুলো আসলে কতটা সত্যি?

তাদের আষাঢ়ে গল্পগুলো সাধারণ মানুষ জানতে পারে না। সাধারণ মানুষ তাদের দেবতা জ্ঞান করে। তারা যা বলে তা-ই বিশ্বাস করে নেয়। এই সুযোগেই তারা তাদের কাল্পনিক গল্পগুলো আমাদের মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছে।

---

১ Pat Shipman, “Doubting Dmanisi”, American Scientist, November-December 2000
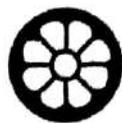
শেষ কথা

ইসলাম কখনোই আচারসর্বস্ব কোনো ধর্মের নাম নয় যে এটাকে কিছু তন্ত্র-মন্ত্র, কিছু দোয়া-দরূদ আর কিছু উৎসব-আনন্দের গন্ডির মধ্যে ফেলে বিচার করতে হবে।

ইসলাম একটি দ্বীনের নাম। দ্বীন অর্থ যতখানি না ধর্ম, তারচেয়েও বেশি পরিপূর্ণ জীবনবিধান। ইসলামে এমন একটি নীতিও নেই, এমন একটি কথাও নেই যা একজন মানুষের কাছে অসম্ভব, অযৌক্তিক ঠেকতে পারে।

অজ্ঞেয়বাদী এবং নাস্তিকেরা যে ভুলটি করে তা হলো, তারা ভাবে পৃথিবীতে একত্ববাদের ডাক মনে হয় সর্বপ্রথম মুহাম্মদ (সা.) দিয়েছিলেন। এর আগে পৃথিবীতে মনে হয় একত্ববাদী কেউ ছিল না। পুরো পৃথিবী মনে হয় খ্রিস্টান, ইহুদী, হিন্দু ইত্যাদিতে ভরা ছিল। এমনটি যারা ভাবে, তারা খুব ভুল ভাবে এবং ভুল জানে। সৃষ্টিলগ্ন থেকেই পৃথিবীর মধ্যে একত্ববাদের অস্তিত্ব ছিল এবং সেটা চিরকালই থাকবে। আরজ আলী মাতুব্বর সাহেব উনার জানার গন্ডির মধ্য থেকে যে সকল প্রশ্ন, যে সকল যুক্তি আস্তিক তথা মুসলমানদের দিকে ছুড়ে দিয়েছেন, তা শিক্ষিত, যিনি ধর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি জানেন, বোঝেন, তার কাছে নিতান্তই শিশুসুলভ মনে হবে।

আবার যার ধর্মীয় জ্ঞান নেই এবং নেই বিজ্ঞান নিয়ে পর্যাপ্ত পড়াশুনা, তার কাছে আরজ আলী মাতুব্বর সাহেবের প্রশ্নগুলোকে অত্যন্ত যৌক্তিক মনে হতে পারে।

আরজ আলী সাহেবের বই পড়ে বিভ্রান্ত হবার আশঙ্কা এদের ক্ষেত্রেই বেশি।

বাস্তব জীবনে অনেককেই আরজ আলী সাহেব কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে নিজের বিশ্বাস নিয়ে সন্দিহান, দোদুল্যমান অবস্থায় থাকতে দেখেছি। আরজ আলী সাহেবের যুক্তিগুলোকে রেফারেন্স হিসেবে ধরে অনেককে দেখেছি তর্ক-বিতর্ক করতে। অনেকেই উনার প্রশ্নের উত্তর, যুক্তির বিপরীতে যুক্তি চাইত। মূলত এই শ্রেণিকে টার্গেট করেই রচিত এই বই।

লেখক পরিচিতি

আরিফ আজাদ। জন্মেছেন চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার সময় থেকেই লেখালেখির হাতেখড়ি। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনা করতেই বেশি পছন্দ করেন। ২০১৭ সালের একুশে বইমেলায় *'প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ'* লিখে ব্যাপক জনপ্রিয়তা কুড়ান। বিশ্বাসের কথাগুলোকে শব্দে রূপ দিতে পছন্দ করেন। অবিশ্বাসের দেয়ালে অনুপম স্পর্শে বিশ্বাসের ছোঁয়া দিতে তাঁর রয়েছে ব্যাপক মুন্সিয়ানা। একুশে বইমেলা - ২০১৮ তে তাঁর রচিত দ্বিতীয় বই *'আরজ আলী সমীপে'*।

জগতে আলো-অন্ধকারের মতো, সত্য-মিথ্যার একটা লড়াই বিরাজমান ছিল, আছে, এবং শেষ দিন পর্যন্ত বহাল থাকবে। জাহিলিয়াতের দ্বন্দ্বগুলো শেষ হয়ে যায়নি এবং যাবে না। এগুলো নানান সময়ে নানান রূপে আমাদের সামনে এসে ধরা দেবে।

‘ওটা মিথ্যা’

‘ওটা অযৌক্তিক’

‘ওটা অবিশ্বাস্য’

‘ওটা অবৈজ্ঞানিক’

‘ওটা কেবল অন্ধবিশ্বাস’

এরকম নানান প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছে তাঁরা। তাদের মিথ্যাচার, যুক্তির অসারতা, অবিশ্বাসের দর্শন, পক্ষপাতী বিজ্ঞান পাঠ এবং বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগের বিপরীতে ‘আরজ আলী সমীপে’ হতে পারে একটি ভিন্ন মাত্রার সংযোজন।

ISBN
9 789843 439567

সমকালীন প্রকাশন

জগতে আলো-অন্ধকারের মতো, সত্য-মিথ্যার একটা লড়াই বিরাজমান ছিল, আছে, এবং শেষ দিন পর্যন্ত বহাল থাকবে। জাহিলিয়াতের দ্বন্দ্বগুলো শেষ হয়ে যায়নি এবং যাবে না। এগুলো নানান সময়ে নানান রূপে আমাদের সামনে এসে ধরা দেবে।

'ওটা মিথ্যা'
'ওটা অযৌক্তিক'
'ওটা অবিশ্বাস্য'
'ওটা অবৈজ্ঞানিক'
'ওটা কেবল অন্ধবিশ্বাস'

এরকম নানান প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছে তাঁরা। তাদের মিথ্যাচার, যুক্তির অসারতা, অবিশ্বাসের দর্শন, পক্ষপাতী বিজ্ঞান পাঠ এবং বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগের বিপরীতে 'আরজ আলী সমীপে' হতে পারে একটি ভিন্ন মাত্রার সংযোজন।

ISBN
9 789843 439567

সমকালীন প্রকাশন

আরজ আলী সমীপে ■ আরিফ আজাদ

আরজ আলী সমীপে

আরিফ আজাদ